ইউনিট ৩

শিল্পোদ্যোগীয় প্রেষণা
(Entrepreneurial Motivation)

ভূমিকা (Introduction)

একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে অন্যান্য কর্মীদের দ্বারা কার্য সম্পাদন করিয়ে নিতে হয়। তাই কর্মী নির্বাচনের সময় অবশ্যই দক্ষ ও যোগ্য কর্মী নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু একজন লোক শুধু যোগ্য ও দক্ষ হলেই ভাল কার্য সম্পাদন করবে তা আশা করা যায় না। কারণ, ভাল কার্য সম্পাদনের সাথে কর্ম প্রেষণাও বিশেষভাবে জড়িত। তাই, যে কোন মানুষের কর্ম সম্পাদনের সাথে কর্ম দক্ষতা ও কর্ম প্রেষণা পরস্পর নির্ভরশীল। কোন দক্ষ লোকের মধ্যে যদি কর্ম প্রেষণা ও কর্ম উদ্যোমতা না থাকে তবে তার দ্বারা ভাল কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে একটু কম দক্ষ অথচ কর্ম প্রেষণা ও কর্ম উদ্যোমতা যথেষ্টঃ এ ধরণের লোকের পক্ষে ভাল কর্ম সম্পাদন সম্ভব।

প্রেষণা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রেষণা বলতে একটি প্রাণীর এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যা তাকে কোন কাজে উৎসাহিত করে। তাই প্রেষণা কর্মের চালিকা শক্তি, এটা মানুষের কর্মস্পৃহা যোগায়। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীগণ (হাল, স্পেন্স ও ব্রাউন) প্রেষণাকে প্রাণীর আচরণের শক্তি সঞ্চয়কারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই কর্মীদেরথেকে ভাল কাজ করানোর জন্য কর্মীদেরকে ভালভাবে প্রেষিত করা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা প্রেষণার সংজ্ঞা, প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য, প্রেষণা ও কর্ম সম্পাদন, প্রেষণা সৃষ্টিকারী উপাদান, বিভিন্ন প্রেষণা তত্ব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ-১ ঃ প্রেষণা, প্রেষণা ও কর্ম সম্পাদন, প্রেষণা চক্র, প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য (Motivation, Motivation and Performance, Motivation Cycle and Characteristics of Motivated Behavior)

উদ্দেশ্য

এ পাঠশেষে আপনি-

- প্রেষণার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- প্রেষণা চক্র সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- প্রেষণার সাথে কর্মসম্পাদনের সম্পর্ক জানতে ও বলতে পারবেন।

প্রেষণার সংজ্ঞা (Definition of Motivation)

প্রেষণা কর্মসম্পাদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদন। প্রেষণা সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা ভুল। কারণ, সাধারণত: মানুষকে কাজে উৎসাহিত করাকে প্রেষণা বুঝিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উৎসাহ প্রদান প্রেষণা নয়। প্রকৃত পক্ষে প্রেষণা কোন একটা প্রাণীর এমন একটি অর্ন্তনিহিত অবস্থা বোঝায়; যা, তাঁকে কোন আচরণে বা কাজে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করে। প্রতিটি মানুষ বা অন্য কোন প্রণীর প্রতিটি কাজের পিছনে প্রেষণা কাজ করে। প্রেষণা ব্যতিত কোন প্রাণী কাজ করে না। ধরুণ আপনি বর্তমানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিবিএস প্রগ্রামে অধ্যায়ন করছেন। এ প্রোগ্রামে ভর্তি হবার পূর্বে আপনার মনের মধ্যে একটি আকাঙ্খার সৃষ্টি হয় সেজন্যই আপনি এ প্রগ্রামে ভর্তি হয়েছেন। আপনার এ আগ্রহটাকে জাগিয়ে তুলার প্রক্রিয়াই হলো প্রেষণা। তাই মানুষের প্রায় প্রতিটি কাজের পিছনেই প্রেষণা কাজ করে। তবে কিছু কিছু কাজ যেমন: হাঁচি দেয়া, চোখের পালক দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো প্রেষিত আচরণ নয়। এ ধরণের আচরণকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলা হয়।

প্রেষণা চক্র (Motivation Cycle)

প্রেষণাকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) অভাব বোধ, (২) উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বা কারণ আচরণ, এবং (৩) লক্ষ্যবস্তু অর্জন। মানুষ বা প্রাণীর প্রেষণার এ তিনটি অবস্থা বা পর্যায় চক্রাকারে আবর্তিত হয় বলে একে 'প্রেষণা' চক্র বলা হয়। মানুষের প্রেষণা চক্রের প্রথম অবস্থা বা ধাপ হলো অভাব বোধ, যার ফলে মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে একটি অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়, ফলে সে এ অভাব দূর করার প্রয়োজন অনুভব করে। প্রেষণা চক্রের দ্বিতীয় ধাপ বা স্তর হলো অভাব দূরীভূত করার লক্ষ্যে কারণ আচরণ (Instrumental behavior)। প্রেষণার তৃতীয় স্তরে বা ধাপে লক্ষ্য বস্তু অর্জনের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরের অস্থির অবস্থার সাময়িক উপশম হওয়া এবং প্রেষণার পরিতৃপ্তি লাভ করা, কিন্তু প্রেষণা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া; কারণ হলো মানুষের মধ্যে আমরণ পর্যন্ত অভাব বোধ জাগ্রত থাকে। তাই একটা প্রেষণার পরিতৃপ্তি লাভ করলে, অন্য প্রেষণা মানুষকে আবার নতুন কাজে উৎসাহিত করে এবং এমনি করে মানুষের আচরণ আজীবন প্রেষণা চক্রের ভিতর দিয়ে আবর্তিত হতে থাকে। চিত্রের সাহায্যে প্রেষণা চক্র দেখান হলো:

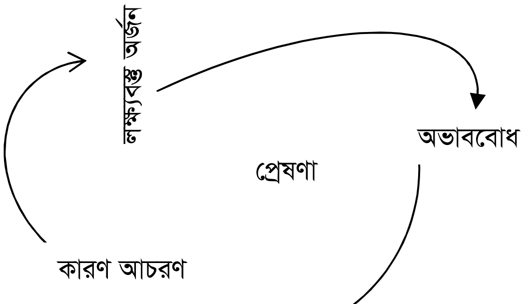

চিত্র: প্রেষণা চক্র

প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Motivated Behavior)

প্রেষিত আচরণের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে:

১. **প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত:** প্রেষিত আচরণ মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত বা পরিচালিত করে। ধরুণ, আপনার পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। আপনি পানির দিকে যাবেন, খাদ্যের দিকে নয়। অথবা কেউ ক্ষুধার্থ হলে পানির দিকে না যেয়ে খাদ্যের দিকে ধাবিত হবে। তাই প্রেষিত আচরণকে নির্বাচনমূলক আচরণও বলা হয়।

২. **প্রেষিত আচরণ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী:** কোন মানুষ বা প্রণীকে যদি খাদ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তবে, বঞ্চনার সময় যত বেশী হবে, উত্তেজনা বা আগ্রহ তত বেশী বাড়তে থাকে এবং তা লাভের জন্য চেষ্টাও তত স্থায়ী হবে এবং পৌন:পৌনিক হবে। তবে অবিরাম চেষ্টার পর যদি লক্ষ্য বস্তু আয়ত্তে না আসে তবে সে আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে পড়বে এবং লক্ষ্য বস্তু অন্বেষণ থেকে বিরত থাকবে।

৩. **প্রেষিত আচরণ ভারসাম্য সংস্থাপক:** মানুষের মনে কোন বিষয়ে অভাব জাগ্রত হলে শরীরের অভ্যন্তরে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় এবং লক্ষ্য অর্জিত হলে শরীরের অভ্যন্তরে পূনরায় ভারসাম্য ফিরে আসে। শীরের ভেতরের উপাদানগুলো ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা (Homostasis)

৪. **প্রেষিত আচরণ অভ্যন্তরীণভাবে সৃষ্ট:** প্রেষিত আচরণ বাইরের কোন বস্তু বা ঘটনার দিকে ধাবিত হয়, তবে এর উদ্ভব হয় শরীরের ভেতর কোন পরিবর্তন বা চাহিদার জন্য যেমন ধরুণ, কারো ক্ষুধা বা পানির পিপাষা লেগেছে; যা, প্রাণীর শরীরের ভেতর টিস্যুর পরিবর্তিত অবস্থার জন্য সৃষ্টি হয়।

কর্মসম্পাদন ও প্রেষণা
(Performance and Motivation)

শিল্প মণোবিজ্ঞানীরা কর্ম সম্পাদনের জন্য দুটি উপাদানের কথা বলেছেন। একটি হলো ব্যক্তির কর্মদক্ষতার পরিমাণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন কাজ করার পরিমাণ নির্ভর করে তার কাজকরার গুনাবলী কতটা বিরাজমান। আর দ্বিতীয়টা হলো কাজ করার জন্য ব্যক্তির প্রেষণা। অর্থাৎ কোন কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রেষণা কতটা রয়েছে তার উপর। কিছু সংখ্যক গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যক্তির কর্মসম্পাদনের কর্মদক্ষতা ও কর্ম প্রেষণার উপর। তবে ব্যক্তির কর্মসম্পাদনের উপর কর্মদক্ষতা ও কর্মপ্রেষণার প্রভাব নিরপেক্ষ (Independent) নয়, বরং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। বিখ্যাত মণোবিজ্ঞানী ভ্রুম (Vroom,1964) ১৯৬৪ সালে কর্ম দক্ষতা ও কর্ম প্রেষণা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সূত্র দিয়েছেন যা নিম্নরূপ:

কর্মসম্পাদন (Performance) = কর্মক্ষমতা (Ability) x প্রেষণা(Motivation)। এ সূত্র থেকে বুঝা যায় যে, কর্মসম্পাদনের উপর কর্মক্ষমতা ও প্রেষণার প্রভাব সংযোজনশীল (additive) নয়, বরং গুণনশীল (Multiplicative)। এতে আরো জানা যায় যে, ব্যক্তির কর্মক্ষমতার মান কম হলে তার কর্মপ্রেষণা বাড়িয়ে কর্ম সম্পাদনের পরিমাণ বড়ানো সম্ভাব। তবে তার চেয়ে, কর্মদক্ষতার মান বেশী থাকলে, তার কর্ম প্রেষণা বৃদ্ধি করে, তার কর্মসম্পাদনের পরিমাণ বেশী বাড়ানো যায়। তবে এ দুটি উপাদানের একটির মাত্রা নিচে রেখে অপরটির মান বাড়িয়ে কর্মসম্পাদনের মান খুব বেশী বড়ানো যায় না। কর্ম প্রেষণার মাত্রা বেশী বেড়ে গেলে কর্মসম্পাদনের পরিমাণ আবার কমে যায়। এর ব্যাখ্যা হিসেবে দুটি কারণ বলা হয়েছে। যথা ১। কর্ম প্রেষণা বেশী মাত্রায় হলে তার চিন্তার পরিসর (Cognetive Field) কমে যায় ফলে, সে নতুন ও জটিল কাজ ভাল করতে পারে না (Johnson, 1952)। দ্বিতীয় কারণটি হলো, লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেষণা অতিমাত্রায় হলে ব্যর্থতা এড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা, আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়; ফলে কর্মসম্পাদন হ্রাস পায় (Schachter, et al. 1961)। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে প্রেষণার সাথে কর্মসম্পাদনের সম্পর্ক দেখানো হলো।

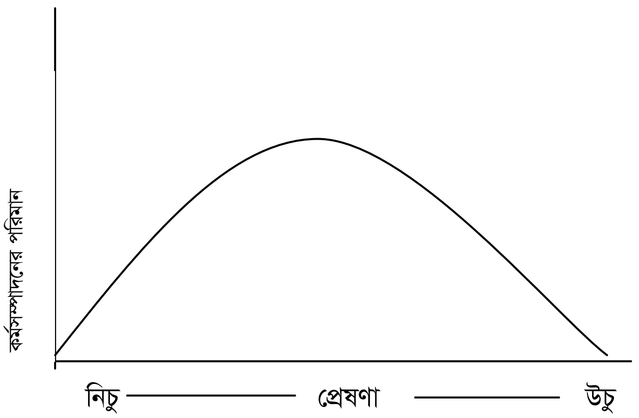

পাঠসংক্ষেপ

প্রেষণা অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রেষণা বলতে একটি প্রাণীর এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যা তাকে কোন কাজে উৎসাহিত করে। তাই প্রেষণা কর্মের চালিকা শক্তি, এটা মানুষের কর্মস্পৃহা যোগায় ।

প্রেষণা কর্মসম্পাদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদন। প্রেষণা সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা ভুল। কারণ, সাধারণত: মানুষকে কাজে উৎসাহিত করাকে প্রেষণা বুঝিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উৎসাহ প্রদান প্রেষণা নয়। প্রকৃত পক্ষে প্রেষণা কোন একটা প্রাণীর এমন একটি অর্ন্তনিহিত অবস্থা বুঝায়; যা তাঁকে কোন আচরণে বা কাজে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করে। প্রতিটি মানুষ বা অন্য কোন প্রণীর প্রতিটি কাজের পিছনে প্রেষণা কাজ করে। প্রেষণাকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) অভাব বোধ, (২) উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বা কারণ আচরণ, এবং (৩) লক্ষ্যবস্তু অর্জন।

শিল্প মণোবিজ্ঞানীরা কর্ম সম্পাদনের জন্য দুটি উপাদানের কথা বলেছেন। একটি হলো ব্যক্তির কর্মদক্ষতার পরিমাণ। আর দ্বিতীয়টা হলো কাজ করার জন্য ব্যক্তির প্রেষণা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রেষণার সংজ্ঞা দিন।

২. প্রেষণা চক্র কি ?

৩. প্রেষীত আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কর্মসম্পাদন ও প্রেষণা বর্ণনা করুন।

২. প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

পাঠ-২ ঃ প্রেষণা ও প্ররোচক (Motivation and Incentives)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্ররোচক কি তা বলতে পারবেন;
- প্ররোচক কত প্রকার ও কি কি তা জানতে ও বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার প্ররোচকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

প্ররোচক (Incentives)

প্ররোচক হলো এমন একটি বাহ্যিক উপকরণ বা উপাদান যা ব্যক্তির চাহিদা পূরণ বা অভাব দূর করতে সক্ষম। কোন ব্যক্তির চাহিদা বা অভাব বোধ তার অভ্যন্তরীণ বিষয়। আর প্ররোচক হলো বাহ্যিক বিষয় যা মানুষের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অভাব বা চাহিদা পূরণে সক্ষম। যেমন ধরুণ, আপনি ক্ষুধার্থ, এটা আপনার অভাব যা আপনার অভ্যন্তরে সৃষ্ট; আর খাদ্য হলো প্ররোচক যা আপনার ক্ষুধা মিটাতে পারে। তাই বলাযায়, মানুষ তার অভ্যন্তরের অভাববোধের কারণে তা পূরণের জন্য যে বস্তুর দিকে ধাবিত হয় তাই হলো প্ররোচক।

প্ররোচক ব্যক্তির প্রেষণা শক্তিকে জাগ্রত করে বলে শিল্প ক্ষেত্রে প্ররোচক কর্মচারণ(Work behavior) এর উত্তেজক শক্তি (Spurring force) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কর্মের প্রেষণা সৃষ্টিকরার জন্য প্রধানত দু ধরণের প্ররোচক প্রয়োগ করা হয়। যথাঃ ১। আর্থিক প্ররোচক ২। অনার্থিক প্ররোচক ।

আর্থিক প্ররোচক (Financial Incentives)

আর্থিক প্ররোচক বলতে কোন ব্যক্তিকে নগদ অর্থ বা এমন কোন দ্রব্য প্রদান করা, যার বিনিময়ে সে তাঁর বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারে। প্ররোচক হিসেবে অর্থ সরাসরি বা নিজস্ব কোন মূল্য বহন করে না। তবে, দুটি কারণে মানুষ সমাজে অর্থসম্পদকে প্ররোচক হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যথাঃ ১। মানুষের জীবনের নানাবিধ অভাব পূরণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের বিনিময় হিসেবে টাকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ২। টাকা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ দুটো কারণে টাকা মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্ররোচক হিসেবে কাজ করে থাকে।

বিভিন্ন প্রকার আর্থিক প্ররোচক (Different Types of Financial Incentives)

শিল্পে নিয়োজিত কর্মীবহিনীর প্রেষিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আর্থিক প্ররোচক ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **উৎপাদনের ভিত্তিতে মজুরী প্রদানঃ** এ পদ্ধতিতে উৎপাদনের পরিমাণের উপর মজুরী প্রদান করা হয়। অর্থাৎ যে যত বেশী উৎপাদন করছে তাকে তত বেশী মজুরী প্রদান করা হবে। ফলে মানুষের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ জাগ্রত হবে। এক্ষেত্রে কর্মীর কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতাকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয় বলে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানুষ স্বচেষ্ট থাকে।

২. **সময়ের ভিত্তিতে মজুরী প্রদানঃ** এ পদ্ধতিতে যে যত বেশী সময় কাজ করে, সে তত বেশী মজুরী পাবে। ফলে মানুষ বেশী সময় কাজ করতে আগ্রহী হবে। এ পদ্ধতি ব্যবস্থাপক, নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য সাদাপোশাকী (White Collar Employee) তাদের জন্য বেশী প্রযোজ্য। তবে যে ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রমিকের উৎপাদন অন্য শ্রমিকদের থেকে পৃথক করে নির্দিষ্ট ইউনিটে ভাগ করা সম্ভব হয় না; সে সকল ক্ষেত্রে, সময় ভিত্তিক মজুরী প্রথা বেশী প্রযোজ্য। এতে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হলো উৎপাদনের চেয়ে বেশী সময় কাজ করতে মানুষ বেশী আগ্রহী।

৩. **চাকুরির মেয়াদ বা জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে মজুরী প্রদানঃ** এ পদ্ধতিতে কোন প্রতিষ্ঠানে যে যত বেশী দীর্ঘ সময় ব্যাপী কাজ করে, সে তত বেশী মজুরী পেয়ে থাকে। এতে পুরান কর্মচারীগণ বেশী আর্থিক সুবিধা পায়। এর পিছনে প্রধান যুক্তি হলো অভিজ্ঞতার সাথে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, যা সবসময় সঠিক নয়। কারণ, দক্ষতা নির্ভর করার অন্যান্য উপাদানগুলোর মধ্যে মেধা, বিশেষ প্ররোচনা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। সাধারণত সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশী ব্যহৃত হয়ে থাকে। তবে এটা তেমন ফলপ্রসু হয় না।

৪. **উৎপাদন বোনাস:** এ পদ্ধতিতে শ্রমিকদের কাজের আদর্শমান নির্ধারণ করে দেয়া থাকে। আদর্শমানের বেশী উৎপাদন করতে পারলে নির্দিষ্ট হারে বোনাস প্রদান করা হয়। এ বোনাস ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে প্রদান করা যায়। এর ফলে শ্রমিকরা বেশী উৎপাদনে উৎসাহিত হয়।

৫. **কর্মসম্পাদন বোনাস:** এ পদ্ধতিতে শুধু উৎপাদনের উপর বোনাস প্রদান না করে তাঁর সামগ্রীক কর্মসম্পাদনের উপর ভিত্তি করে বোনাস দেয়া হয়। বিশেষ করে যারা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত না হয়ে পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের জন্য এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য। যেমন: পরিদর্শক, কারিগরি কর্মচারী, করণিক, ইত্যাদি। আবার, যারা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় দায়িত্বে নিয়োজিত (যেমন ব্যবস্থাপক,সুপারভাইজার, নির্বাহী) তাদের কর্ম নৈপূণ্য মূল্যায়ন করে এ ধরণের বোনাস দেয়া যায়।

৬. **লভ্যাংশ বন্টন পরিকল্পনা:** কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যবসায়ের নীট লাভের একটি অংশ তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বাংলাদেশের Profit Sharing আইন অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নীট লাভের ৫% হারে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টনের বিধান রাখা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ অধিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বেশী মুনাফা আর্জনে উৎসাহিত হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কমিটমেন্ট, একাত্বতা ও অংশীদারীত্বের মনোভাব জন্মায়। যার ফলে, সকলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাগ্র ও উৎস্বর্গকৃতভাবে কাজ করে (Nunn, 1964)।

৭. **দলগত প্ররোচক পরিকল্পনা:** এ পদ্ধতিতে কাউকে এককভাবে বোনাস না দিয়ে দলের সামগ্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে বোনাস দেয়া হয়। যেখানে একজনের উৎপাদন পৃথকীকরণ করা সম্ভব না হয়। বিশেষ করে সেক্ষেত্রে পরস্পরের কাজ সম্পর্ক যুক্ত ও নির্ভরশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে। যেমন যন্ত্রাংশ সংযোজনের কাজ। এ ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো ব্যক্তিগত পুরস্কার প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত না হওয়া ভাল ও মন্দ সবাইকে সমান হারে বোনাস প্রদান করা হয় বলে অপেক্ষাকৃত দক্ষ শ্রমিকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৮. **প্রান্তিক সুবিধা:** আর্থিক প্ররোচক বলতে শুধু মজুরী বা বেতনকেই বুঝায় না। বিভিন্ন ধরণের প্রান্তিক সুবিধা যেমন: চিকিৎসা ভাতা, যতায়াত ভাতা, দূর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতিপূরণ, চিত্তবিনোদন ভাতা, অবসর ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা প্রভৃতি মানুষকে কর্মে উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনার্থিক প্ররোচক (Nonfinancial Incentives)

কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের অনার্থিক প্ররোচক ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. **স্বীকৃতি ও পুরুস্কার:** মানুষ কাজের মাধ্যমে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। ভাল কাজে স্বীকৃতি ও পুরস্কার মানুষকে প্রেষিত করে। কাজের স্বীকৃতি পেলে কর্ম প্রেষণাসহ কমিটমেন্ট; একাগ্রতা ও উৎস্বর্গকৃত হয়ে উঠে। বহু গবেষক ভাল কাজের জন্য স্বীকৃতি ও পুরুস্কারের সুপারিশ করেছেন। পুরুস্কার বিভিন্নভাবে দেয়া যেতে পারে; যেমন: আর্থিক পুরুস্কার, পদোন্নতি, পদক, খেতাব, প্রশংসা, ভাল কর্ম পরিবেশ, ইত্যাদি। গবেষণার ফলাফলে আরো দেখা যায় যে, কর্ম প্রেষণায় তিরস্কারের চেয়ে পুরস্কার আরো বেশী ফলপ্রসু (Moier,1965)। বেশ কয়েকটি গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ভাল কর্মসম্পাদনের জন্য প্রকাশ্য বা খোলাখুলিভাবে প্রশংসা ও মন্দ কর্মসম্পাদনের জন্য একান্ত ও ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনা করা হলে তা ব্যক্তির কর্ম প্রেষণার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে (Moore, 1939; Farson,1963)।

২. **সিদ্ধান্তে অংশগ্রহনের সুযোগ:** কর্মীদেরকে তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হলে কর্ম প্রেষণা ও একাগ্রতা বৃদ্ধিপায়। প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে কর্মচারীদের মতামতের গুরুত্ব দিলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা (Commitment) অর্ন্তভূক্তি বোধ (Sense of Involvement) ও উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ শুধু কর্ম সন্তোষটি ও প্রেষণাই বৃদ্ধি করে না, বরং তার সাথে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৩. **চাকরির নিরাপত্তা:** প্রতিটি মানুষ কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা ও চাকরিচ্যুতির ভয় থেকে নিরাপত্তা চায়। চাকরির স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তা না থাকলে কাজে উৎসাহ পায় না। গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বিবাহিত এবং অপেক্ষাকৃত প্রবীন কর্মচারীরা, অবিবাহিত ও তরুণ কর্মচারীর থেকে চাকরির নিরাপত্তাকে প্ররোচক হিসেবে বেশী গুরুত্ব দেয়।

৪. **কর্মে স্বায়ত্বশাসন:** বেশীরভাগ মানুষই কর্মে স্বাধীনতা চায়। নিজ কর্মে স্বাধীনতা পেলে কাজে উৎসাহ বোধ করে। তবে উচু স্তরের কর্মচারীর নিম্ন স্তরের কর্মচারীদের চেয়ে স্বায়ত্বশাসনকে কর্ম সন্তুষ্টি ও পেষণার জন্য বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, যে সকল শ্রমিকদের কাজে পরিদর্শক বেশী হস্তক্ষেপ করে, তাদের কর্মপ্রেষণা ও উৎপাদনের চেয়ে যারা কাজকর্মে পরিদর্শকদের থেকে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে তাদের কর্ম প্রেষণা ও উৎপাদনের হার বেশী (Likert,1961)।

৫. **পদোন্নতির সুযোগ:** প্রত্যেক ব্যক্তিই পেশাগত জীবনে পদোন্নতি ও অগ্রগতি প্রত্যাশা করে। যখন কর্ম সম্পাদনের উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেয়া হয়, তখন কর্মচারীদের মধ্যে কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা জন্মায়। তবে নিম্নস্তরের চেয়ে উচু স্তরের কর্মচারীগণ পদোন্নতির সুযোগ বেশী প্রত্যাশা করে। পদোন্নতি প্ররোচক হিসেবে গুরুত্ব হবার কারণ হলো- পদোন্নতির সাথে বেতন বৃদ্ধির, মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির নীবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

৬. **প্রতিযোগিতা:** মানুষের মধ্যে কর্ম প্রেষণার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রতিযোগীতামূলক কর্ম পরিবেশ। কারণ, প্রতিযোগিতা থাকলে প্রত্যেকে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য স্বচেষ্ট থাকে। কারণ, নিজেকে অন্যের তুলনায় যোগ্য প্রমাণ করতে পারলে অত্নমর্যদা ও আত্নতৃপ্তি লাভ করে। তবে বেশী প্রতিযোগিতামূলক কর্মীদের মধ্যে রেষারেষি বা শ্রক্রতা সৃষ্টি করে, ফলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। তবে সুস্থ ও ইতিবাচক দলগত প্রতিযোগিতা প্রেষণা বৃদ্ধি করে।

৭. **অভিন্ন লক্ষ্য:** অভিন্ন লক্ষ্য কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধি করে। তাই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও কর্মচারীদের লক্ষ্যের মধ্যে মিল থাকা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক হলে কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধিপায়, আর নেতিবাচক হলে কর্মচারীদের কর্মপ্রেষণা হ্রাস করে।

৮. **সহকর্মীদের সাথে ভাল সম্পর্ক:** সহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক ভাল কর্ম পরিবেশ উপহার দিতে পারে। ভাল সম্পর্ক দলীয় সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব, দলীয় লক্ষ্য অর্জনে একাগ্রতা ও কর্মে উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

৯. **প্রশিক্ষণের সুযোগ:** কোন কাজ যত ভালভাবে করতে পারা যাবে, কর্মের প্রতি আগ্রহ তত বেশী বৃদ্ধি পাবে। আবার কোন কাজে দক্ষতা ও জ্ঞান নির্ভর করে সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের উপর, তাই যদি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকে, তবে কর্মীদের মধ্যে কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ প্রেষণা ও উৎসাহ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Ali, 1979)।

১০. **উন্মুক্ত যোগাযোগ:** উন্মুক্ত যোগাযোগ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। কর্মচারীদের মনোভাব, মনোবল ও কর্ম প্রেষণার উপর যোগাযোগের প্রভাব অত্যধিক। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ বসের সাথে খোলামেলাভাবে মত বিনিময় ও কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়, তবে কর্মচারীদের মধ্যে কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধি পায়। যদি খোলামেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকে তবে পরস্পরের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। ফলে মনোবল ও কর্মপ্রেষণা হ্রাসপায় (Ali,1976)।

১১. **সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতিমালার অনুসরণ:** সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতিমালার প্রয়োগ যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে মনোবল, কর্ম সন্তুষ্টি, ও প্রেষণা সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকাপালন করে। পদোন্নতি, ভাল কাজের স্বীকৃতিপ্রদান, অবদান অনুসারে বেতন, অভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ, শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক রক্ষা করা, অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ করলে কর্মচারীদের প্রেষণা ও মনোবল বৃদ্ধি পায় (Khaleque and Hossain, 1992)।

১২. **সৃজনশীল কাজে উৎসাহ প্রদান:** মানুষের মধ্যে বিশেষ করে যাদের সৃজনশীল প্রতিভা আছে, তারা এ প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ আশা করে। প্রতিষ্ঠান যদি কর্মীদের সৃজনশীল কাজে উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদান করে, তবে তাতে তাঁদের কর্মে উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে যায়। মেধা ও প্ররোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাজে ব্যক্তির সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হয়। তাই সে প্রতিভার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ পচ্ছন্দ করে ও তাতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আর্থিক ও অনার্থিক উভয় প্রকার প্ররোচকই কর্ম প্রেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর্থিক প্ররোচক অনার্থিক প্ররোচকের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক প্ররোচক এ দেশে গুরুত্ব বেশী হলেও অনার্থিক প্ররোচকেরও যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ

প্ররোচক হলো এমন একটি বাহ্যিক উপকরণ বা উপাদান যা ব্যক্তির চাহিদা পূরণ বা অভাব দূর করতে সক্ষম। কোন ব্যক্তির চাহিদা বা অভাব বোধ তার অভ্যন্তরীণ বিষয়। আর প্ররোচক হলো বাহ্যিক বিষয় যা মানুষের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অভাব বা চাহিদা পূরণে সক্ষম। কর্মের প্রেষণা সৃষ্টিকরার জন্য প্রধানত দু ধরণের প্ররোচক প্রয়োগ করা হয়। যথা: ১। আর্থিক প্ররোচক ২। অনার্থিক প্ররোচক ।

আর্থিক প্ররোচক বলতে কোন ব্যক্তিকে নগদ অর্থ বা এমন কোন দ্রব্য প্রদান করা, যার বিনিময়ে সে তাঁর বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের অনার্থিক প্ররোচক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সেগুলো হলো-সৃজনশীল কাজে উৎসাহ প্রদান,সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতিমালার অনুসরণ,উন্মুক্ত যোগাযোগ,সহকর্মীদের সাথে ভাল সম্পক,অভিন্ন লক্ষ্য ,প্রতিযোগিতা,পদোন্নতির সুযোগ,কর্মে স্বায়ত্বশাসন,চাকরির নিরাপত্তা,সিদ্ধান্তে অংশগ্রহনের সুযোগ,স্বীকৃতি ও পুরুস্কার ॥

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.প্ররোচক কি?
২.আর্থিক প্ররোচক বলতে কি বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১.বিভিন্ন প্রকার আর্থিক প্ররোচক আলোচনা করুন।
২.অনার্থিক প্ররোচক গুলো আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ ঃ কর্ম প্রেষণার মতবাদসমূহ (Theories of Work Motivation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- কর্মপ্রেষণার বিভিন্ন তত্ত্বের নামগুলো বলতে পারবেন;
- কর্মপ্রেষণা তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিশেষ করে কৃতি প্রেষণার বৈশিষ্ট্য, উপাদান, ও উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- শিল্পোউদ্যোগ উন্নয়ন ও কৃতিপ্রেষণার সম্পর্ক জানতে ও বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু:

প্রেষণার তত্ত্বসমূহ
(Theories of Motivation)

শিল্প ক্ষেত্রে কর্মীদের কর্মসম্পাদন, কর্মসন্তুষ্টি ও মনোবল বৃদ্ধিতে কর্মপ্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিল্পকর্মীদের কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধির জন্য বহু শিল্প মনোবিজ্ঞানীগণ নিরলস গবেষণা পরিচালনা করে অনেক প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য প্রেষণা তত্ত্বের নাম উল্লেখ পূর্বক আলোচনা করা হলো।

মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব
(Maslow's Need Hierarchy Theory)

আব্রাহাম মাস্‌লো ১৯৪৩ সালে প্রথম এ মতবাদটি প্রস্তাব করেন। পরে গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৬৫ এবং ম্যাকগ্রেগর ১৯৬০ সালে এবং মাস্‌লো নিজে এ মতবাদটির পরিবর্তন করেন।

এ মতবাদের মূল কথা হলো মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তার পেছনে তাঁর অভাববোধ বা চাহিদা কাজ করে। মানুষ কাজের মাধ্যমে তাঁর অভাব বা চাহিদা পূরণ করে থাকে। তাই, মানুষের কর্ম প্রেষণা ও কর্ম আচরণ বুঝার জন্য তাঁর চাহিদাগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

তিনি মানুষের চাহিদাগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ জৈবিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, স্নেহ-ভালবাসার চাহিদা, সম্ভ্রমের চাহিদা এবং অত্মপূর্ণতার চাহিদা। এ মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যাস করেছেন এবং এগুলোকে চাহিদার সোপান হিসেবে নামকরণ করেছেন। নিম্নের চিত্রে চাহিদা সোপান তত্ত্বটি দেখানো হলো।

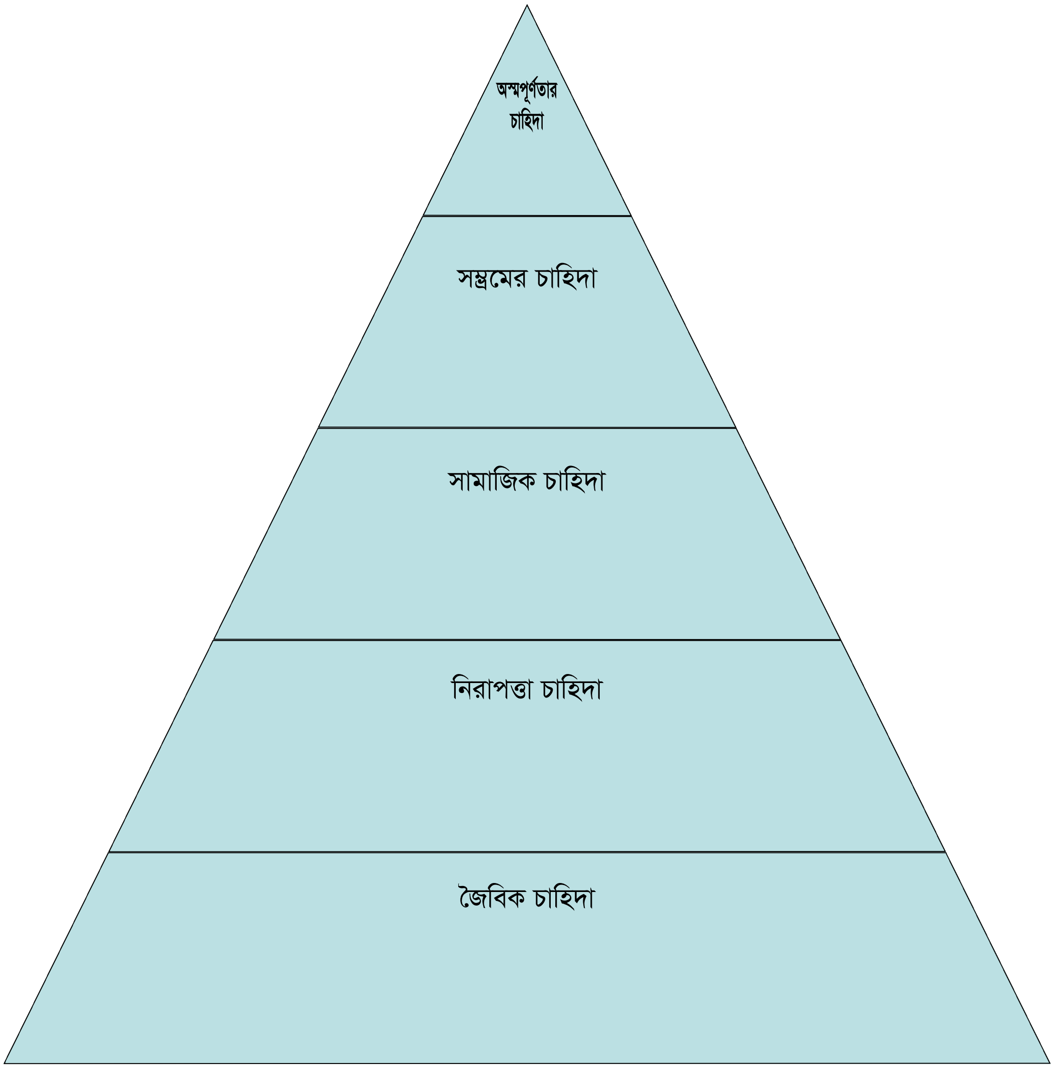

নিম্নে সংক্ষেপে চাহিদাগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো:

১. **জৈবিক চাহিদা** (Physological Need): মাসলোর মতে পাঁচ ধরণের চাহিদর মধ্যে জৈবিক চাহদা সর্বাগ্রে জাগ্রত হয়। এ ধরণের চাহিদাগুলো হলো বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ইত্যাদি। ধনী সমাজে এ চাহিদা প্রায় সবারই পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু, বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে অনেক লোকের পক্ষেই এ জৈবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই আমাদের মত দরিদ্র দেশে অনেক লোককেই এ চাহিদা পূরণের জন্য কর্মে প্রেষিত হয় এবং জৈবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ায় পরবর্তী চাহিদাগুলো পূরণ হতে বাধাগ্রস্থ হয়।

২. **নিরাপত্তার চাহিদা** (Safety Need): জৈবিক চাহিদার ন্যায় অন্য একটি প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার চাহিদা। মানুষের জীবন জীবিকা নিরাপদ না হলে মানুষ উদ্বিগ্নবোধ করে। তাই মানুষ কর্মক্ষেত্রে কাজে নিরাপত্তার জন্য কাজে উৎসাহিত হয়। অন্যায় আচরণ, স্বজনপ্রীতি, দূর্ঘটনা, চাকরিচ্যুতির ভয়ভিতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য কর্মে প্রেষিত করে। কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কর্মে অনুৎসাহিত হয়। আর কর্মে নিরাপত্তা, কর্মে উৎসাহিত করে। তাই কর্মচারীদের ভেতর কর্ম প্রেষণা সৃষ্টির জন্য তাদের কাজের নিরাপত্তার পাশাপাশি অবসর জীবনের নিরাপত্তার জন্য পেনসন ফান্ড, প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্রাচুইটি প্রভৃতি আর্থিক নিরাপত্তা থাকা প্রয়োজন; যা কর্ম প্রেষণাকে বৃদ্ধি করবে।

৩. **সামাজিক চাহিদা** (Social Need): এ তত্ব অনুসারে স্নেহ ভালবাসার চাহিদা ৩য় স্তরে। মানুষ সামাজিক জীব বলে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। অন্যের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায়, মিলেমিশে থাকতে চায় এবং সমাজে সমাদ্রিত হতে চায়। মানুষের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা আছে যা সে অন্যের থেকে আশা করে। তাই অন্যের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা স্থাপন করতে আগ্রহী। মানুষের মধ্যে প্রথম দুটি চাহিদা পূরণ হলে তৃতীয় স্তরের চাহিদার জন্ম নেয়। স্নেহ ভালবাসার চাহিদা যে কারো আচরণের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তাই মানুষকে প্রেষিত করতে চাইলে তার সংশ্লিষ্টতার চাহিদা (Belonging Need) পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. **সম্ভ্রমের চাহিদা** (Esteem Need): মানুষের মান সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তির চাহিদা তাঁর কর্ম আচরণের উপর প্রভাব ফেলে। ম্যাগ্রেগর ১৯৫৭ সালে এ চাহিদাকে আবার দু ভাবে ভাগ করেছে। যথা ১। আত্মসম্মানজনিত চাহিদা- অত্মপ্রত্যয়, কৃতিত্ব, যোগ্যতা ও জ্ঞানের চাহিদা, এবং ২। সুনামজনিত চহিদা- পদমর্যাদা, স্বীকৃতি ও প্রশংসার চাহিদা। তবে এটি উঁচু স্তরের চাহিদা বলে তা সহজে পূরণ হয় না। যদিও সকলেই এ চাহিদার গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও উচু স্তরের কর্মচারীরা মর্যাদার চাহিদাকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

৫. **অত্মপূর্ণতার চাহিদা** (Self Actualization Need): মাসলোর মতে জৈবিক চাহিদা যেমন সর্ব নিম্ন স্তরে, আবার আত্মপূর্ণতার চাহিদার স্থান সর্বোচ্চ স্তরে। মানুষ তার সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের মধ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এ স্তরে খুব কম মানুষই আসতে পারে। তবে নিম্ন স্তরের চেয়ে উচু স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে আত্ম পূর্ণতার চাহিদা পূরণের সুযোগ বেশী থাকে।

পর্যায়ক্রমিক চাহিদা তত্বের মৌলিক অনুমানসমূহ : পর্যায়ক্রমিক চাহিদা তত্ত্বের মৌলিক অনুমানসমূহ হলো :

১. মানুষের প্রেষিত আচরণের উৎস হলো অভাব বা চাহিদা।
২. মানুষের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলো পাঁচ প্রকার। যথা: জৈবিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, স্নেহ-ভালবাসার চাহিদা, সম্ভ্রমের চাহিদা ও আত্মপূর্ণতার চাহিদা।
৩. এ চাহিদাগুলো পর্যায়ক্রমে আসে। সর্ব প্রথম জৈবিক চাহিদা আসে; আর সর্বশেষ আত্মপূর্ণতার চাহিদা আসে।
৪. যে চাহিদাপূরণ হয় তা দ্বারা মানুষকে প্রেষিত করা যায় না।
৫. মানুষকে প্রেষিত করতে হলে তার পরবর্তী চাহিদা পূরণ দ্বারা মানুষকে প্রেষিত করা যায়।
৬. তাই কোন মানুষকে প্রেষিত করতে হলে তাঁর কোন স্তরের চাহিদা অপূর্ণ আছে তা নির্ধারণ করে তা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

তাই একজন ব্যবস্থাপকের কাজ হলো কার কোন স্তরে চাহিদা বর্তমানে অপূর্ণ আছে তা নির্ধারণ করে পূরণকরার ব্যবস্থা করা।

হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ব (Hertzberg's two factor Theory)

হার্জবার্গ ও তার সহযোগীগণ ১৯৫৯ সালে আমেরিকার পিটাসবার্গ এলাকায় নয়টি শিল্প কারখানার ২০৩ জন প্রকৌশলী ও হিসাব রক্ষকদের উপর কর্ম সন্তুষ্টি ও কর্ম প্রেষণার উপর গবেষণা চালিয়ে গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যে তত্বটি দাঁড় করান তাকেই হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ব নামে অবহিত করা হয়। তাঁরা পরীক্ষণ পাত্রদের কাঠামগত প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষ্যাৎকার গ্রহণ করেন। তাদের প্রশ্ন ছিল কখন ও কি পরিস্থিতে চাকরি সবচেয়ে ভাল লাগে এবং সবচেয়ে খারাপ লাগে। এ উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারা কর্ম সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত উপাদানগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেন: ১। অর্ন্তনিহিত বা বিষয়গত উপাদান (Intrinsic or Content Factor) ২। বাহ্যিক বা প্রেক্ষিত উপাদান (Extrinsic or Context factor)। অর্ন্তনিহিত উপাদনগুলোকে প্রেষণাগত উপাদান (Motivational Factor) আর বাহ্যিক বা প্রেক্ষিত উপাদানগুলোকে স্বাস্থ্যজনিত উপাদান (Hygine Factor) হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

কর্মের অর্ন্তনিহিত উপাদানগুলো হচ্ছে- কাজের প্রকৃতি, কৃতিত্ব, দায়িত্ব, স্বীকৃতি, পদোন্নতি, আত্মপূর্ণতার সম্ভাবনা ইত্যাদি যাকে প্রেষণার উপাদান বলা হয়। পক্ষান্তরে, কর্মের বাহ্যিক বা প্রেক্ষিত উপাদনগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক নীতি ও প্রশাসনিক নিয়মাবলী, পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা, বেতন, কর্মস্থলের পরিবেশ ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি যা স্বাস্থ্যগত উপাদান বলা হয়েছে।

হার্জবাগের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের মূল কথা হলো কর্ম সন্তুষ্টির উপাদানগুলো কর্ম অসন্তুষ্টির উপাদানগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কর্ম সন্তুষ্টি ও অসন্তুটির উপাদানগুলোর প্রভাব একমুখী। অর্থাৎ প্রেষণাগত উপাদনগুলো শুধু সন্তুষ্টি দিতে পারে আর তার অনুপস্থিতিতে অসুন্তুষ্টি আনায়ন করতে পারে না। পক্ষান্তরে, স্বাস্থ্যগত উপাদান কম হলে অসুন্তুষ্টি সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে হলে সন্তুষ্টি আনায়ন করতে পারে না। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে তত্বটি উপস্থাপন করা হলো।

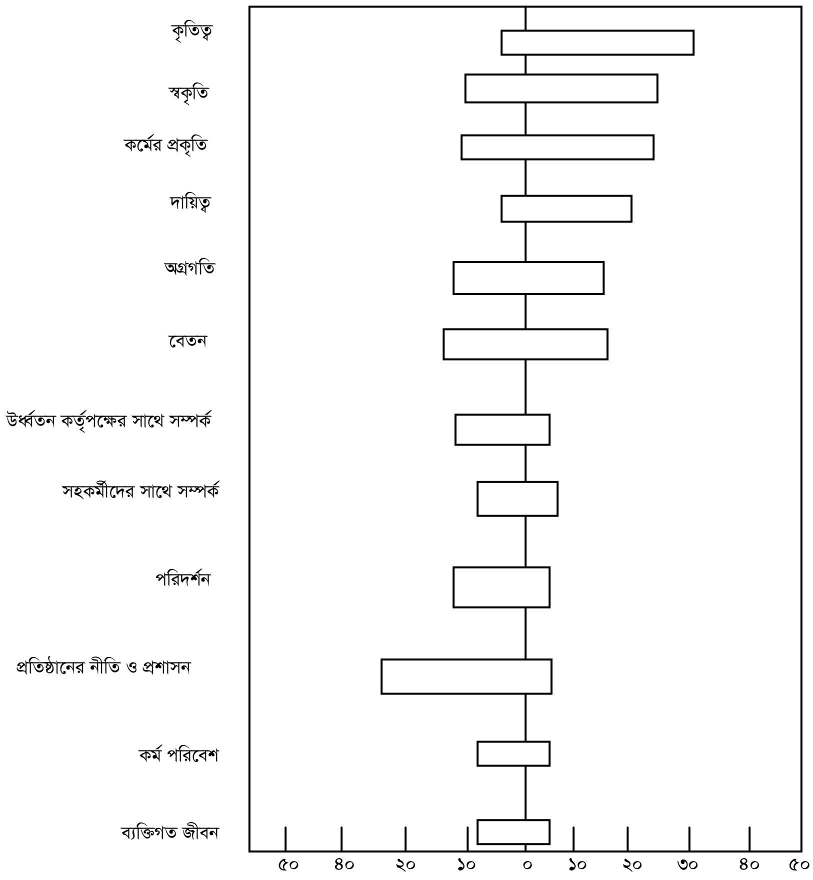

হার্জবার্গের দ্বি-উপাদন তত্ত্বের মৌলিক অনুমান
(Basic Assumptios of Herzberg's Two factors Theory)

১. প্রতিটি ব্যক্তির কর্ম প্রেষণা ও কর্ম সন্তুষ্টির জন্য দু'ধরনের চাহিদা রয়েছে ক) প্রেষণা জনিত চাহদা এবং খ) স্বাস্থ্য জনিত চাহিদা। প্রেষণা জনিত চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় কর্মে দায়িত্ব, কৃতৃত্ব, স্বীকৃতি, পদোন্নতি ইত্যাদির মাধ্যমে। আবার স্বাস্থ্যগত চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় সহকর্মী, পরিদর্শক, ব্যবস্থাপকের সাথে সম্পর্ক, অনুকুল কর্ম পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু নীতির মাধ্যমে।

২. প্রেষিত চাহিদা পূরণ হলে কর্মে সন্তুষ্টি আসে; আর অসম্পূর্ণ থাকলে ব্যক্তির ভিতর অসুন্তুষ্টি সৃষ্টি হয় না।

৩. স্বাস্থ্যগত উপাদান পূর্ণ না হলে কর্মীদের মধ্যে অসুন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়; তবে পূরণ হলে সন্তুষ্ট হয় না।

সমালোচনা

১. এ তত্ত্বটির উপর গবেষণা করে আংশিক সমর্থন পাওয়া গেছে।

২. সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছে যা পদ্ধতিগতভাবে যথোপযুক্ত নয়। কারণ, মানুষের স্বাভাব হলো খারাপের জন্য অন্যকে দায়ী; আর ভাল কিছু হলে নিজের কৃতৃত্ব বলো দাবী করা।

৩. তিনি শুধু প্রকৌশলী ও হিসাবরক্ষকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যারা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই তাদের মতামতকে সাধারণীকরণ (Generalisation) করা যায় না।

৪. গবেষকগণ দাবী করেন যে, উপাদানগুলো একমুখী প্রভাব যা বাস্তবে সত্য নয়। উভয় প্রকার উপাদানেরই দুইমুখী প্রভাব রয়েছে। তবে প্রভাবের মাত্রার পার্থক্য আছে।

তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতা থাকা সত্তেও এ কথা বলা যায়, গবেষকগণ যে উপাদানগুলো চিহ্নিত করেছেন তা কর্ম প্রেষণা ও কর্মসন্তুষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এতে কারো দ্বিমত নেই। তাই এগুলো পূরণের মাধ্যমে কম প্রেষণা বৃদ্ধি করা যায়।

আকর্ষণ-প্রত্যাশা তত্ত্ব (Valence-Expectacyne Theory)

ভ্রুম (Vroom, 1964) আকর্ষণ-প্রত্যাশা মতবাদের প্রবক্তা। তবে পোর্টার ও ললার (Porter and Lawler, 1968) এ মতবাদটি আরো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সুবিন্যস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমতবাদের মূল কথা হলো, যে কাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনের সম্ভাবনা যত বেশী বলে ঐ ব্যক্তির নিকট মনে হবে; সেকাজ করার জন্য তার কর্ম প্রেষণা ও উৎসাহ উদ্দীপনা তত বেশী হবে। যে কাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তাঁর আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে, সে কাজে তত বেশী তৃপ্তিবোধ করে। ভ্রুম তার এ মতবাদটিকে তিনটি ধারণার (Concept) উপর ভিত্তি করে প্রদান করেছেন। ধারণা তিনটি হলোঃ আকর্ষণ (Valence), প্রত্যাশা (Expectation) এবং শক্তি (Force)।

আকর্ষণ বলতে ভ্রুম কোন আসক্তি বা ইতিবাচক মানসিকতাকে বুঝিয়েছেন। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি কোন ব্যক্তির ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব থাকতে পারে। যদি ইতিবাচক মনোভাব থাকে, তবে তা পাবার জন্য সে আপ্রান চেষ্টা করে। আর যদি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তবে তা এড়ানোর জন্য স্বচেষ্ট থাকে। যেমন ধরুণ, একজন শ্রমিক নেতা, সে মনে করে পদোন্নতি পেয়ে কর্মকর্তা হলে সে অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই সে পদোন্নতি না পাবার চেষ্টা করবে। এখানে পদোন্নতির প্রতি তার আকর্ষণ নেতিবাচক।

প্রত্যাশা বলতে এখানে কোন কাজের দ্বারা কাঙ্খিত লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে বুঝানো হয়েছে। ভ্রুমের মতে কর্মপ্রেষণা শুধু মাত্র কোন বস্তুর প্রতি অনুভূতি বা আকর্ষণের উপরই নির্ভরশীল নয় এবং তার সাথে নির্দিষ্ট আচরণ বা কাজ দ্বারা লক্ষ্য বস্তু অর্জন করা সম্ভব হবে কি না সে বিশ্বাসের উপরও নির্ভির করে। যদি কোন কাজ দ্বারা লক্ষ্য বস্তু অর্জনের সম্ভাবনা বেশী বলে মনে করে, তবে কর্ম স্পৃহা আরো বৃদ্ধি পায়।

শক্তি বলতে লক্ষ্য বস্তু পাবার আকর্ষণ বা অনুভূতি ও উক্ত বস্তুপাবার সম্ভাবনা অর্থাৎ প্রত্যাশার সমন্বয়ে সৃষ্ট ইচ্ছা শক্তিকে বুঝানো হয়। ধরা যাক জনাব আঃ রহিম পদোন্নতির প্রতি খুব ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, ভাল কাজ করলে পদোন্নতি পাবার সম্ভাবনা প্রবল। এ দুইয়ের সমন্বয়ে তার মধ্যে ইচ্ছা শক্তি প্রবল হবে এবং সে ভালভাবে কর্ম সম্পাদন করবে।

সমালোচনা

এ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হলো এর ধারণাগত অস্পষ্টতা ও দূরহতা, এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জটিলতা। লক (Locke) এর মত ভ্রুম কর্ম সন্তুষ্টিকে সুখবাদী দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন; যা ঠিক নয়, কারণ মানুষ শুধু সুখের অনুভুতির জন্যই কাজ করে না। তাবে সমালোচনা সত্তেও বলা যায়, মানুষের প্রেষণার ক্ষেত্রে অকর্ষণ প্রত্যাশা তত্বর প্রয়োগিক দিক একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ন্যায় তত্ত্ব (Equity Theory)

এ্যাডামস্ (Adams, 1969) ন্যায় তত্ত্বটি প্রদান করেন। এ মতবাদ অনুসারে একজন কর্মীর কর্ম সন্তুষ্টি ও কর্ম সম্পাদন নির্ভর করে ব্যক্তির দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানের সাম্য ও বৈষম্যের উপর। অর্থাৎ একজন কর্মী সবসময় নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করে যে যে পুরুস্কার বা ফলাফল পাচ্ছে তাতে সাম্য বজায় আছে কি না। অর্থাৎ সমমানের অন্যের চেয়ে সে যখন কম সুযোগ সুবিধা পায় তখন তাঁর মধ্যে অসুন্তুষ্টি কাজ করে। সাধারণতঃ একজন ব্যক্তি যে সকল উপাদানকে তার

অবদানের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে তা হলো-কর্মদক্ষতা, প্রচেষ্টা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কর্মসম্পাদনের পরিমাণ ও গুনাগুন; আর সে সব জিনিসকে অবদানের ফল বা পুরুস্কার হিসেবে গণ্য করে সেগুলো হলো-বেতন, প্রান্তিক সুবিধা, পদমর্যাদা, পদোন্নতি ইত্যাদি।

এ মতবাদ অনুসারে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, সে ন্যায্য পুরুস্কার পাচ্ছে, তবে সে কর্মে সন্তুষ্ট থাকে; আর যদি মনে করে কর্ম ক্ষেত্রে সে ন্যায্য পুরুস্কার পাচ্ছে না তবে সে অসুন্তুষ্ট হবে।

সমালোচনা

১. এ মতবাদের পরিসর অত্যন্ত সীমিত। তাই এটাকে একটি পূর্ণ মতবাদ বলা যায় না।

২. আর একটি অসুবিধা হলো একজন ব্যক্তি তার কর্মক্ষেত্রে তার সাথে কার তুলনা করবে তা নিরুপণ করা কষ্টসাধ্য।

৩. ন্যায় তত্বের কিছু অবদান গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হলেও বেশীর ভাগ অনুমানের সত্যতা সম্পর্কে মিশ্র ফলাফল পাওয়া যায়।

মূল্যবোধ তত্ব (Value Theory)

লক (Locke, 1976) ১৯৭৬ সালে এ মতবাদের প্রবর্তন করেন। তার মতে কোন ব্যক্তির কর্ম প্রেষণা ও কর্ম সন্তুষ্টি নির্ভর করে, সে নির্দিষ্ট কর্ম করার ফলে কি কি বিষয় পাবার প্রত্যাশা করে, তার মূল্যায়নে প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা কত এবং কর্মের ফলে যে বিষয় তাকে দেয়া হবে তা তার নিকট কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার উপর। তাই এ মতবাদ অনুসারে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তির কর্ম সন্তুষ্টি ও অসুন্তুষ্টি নির্ভর করে ব্যক্তিটির কাজের বিনিময়ে কি চায়, আর কি সে পায় এবং যা পায় সেটা তার নিকট কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তার উপর।
ব্যক্তির চাওয়া পাওয়ার প্রক্রিয়াটি তিনটি উপাদানের সাথে জড়িত:

১. কমের্র বিভিন্ন দিক প্রত্যাক্ষণ (Perceptions of different aspects of job),

২. মূল্যবোধের অব্যক্ত বা ব্যক্ত মানদন্ড (Implicit or explicit value standard) এবং

৩. চেতন অথবা অচেতনভাবে প্রত্যক্ষণ ও মূল্যবোধের সম্পর্ক বিস্তার (Conscious or unconcious judgement or the relationship between one's perception and values)

মনে করুন একজন ব্যক্তি মনে করে যে, বেতন বৃদ্ধি তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ এবং আরো বিশ্বাস করে যে ভাল কাজের সাথে বেতন বৃদ্ধির সম্পর্ক নিবিড়, আর যে পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি হবে তা তার ভাল কর্মসম্পাদনের জন্য যথার্থ। তাই, যদি ভাল কাজের জন্য বেতন বৃদ্ধি পায়; তবে, সে ভাল কর্মসম্পাদনের জন্য উৎসাহিত হবে। তাই লকের মতে কাউকে কাজে উৎসাহিত করতে হলে তার প্রত্যাশা আশানুরুপভাবে পূরণ করলে ভাল ফল লাভ করা যাবে।

সমালোচনা

১. লকের মতবাদটি ততটা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক নয় বরং ভাবাবেগ দ্বারা বেশী তাড়িত (Landy and Trumbo, 1980)।

২. লকের মতে, কর্মের সব উপাদানে সন্তুষ্টি ব্যক্তির সার্বিক কর্ম সন্তুষ্টিকে সমভাবে প্রভাবিত করে না, বরং ব্যক্তি যে উপাদানকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে,সে উপাদানে সঠিক কর্ম সন্তুষ্টিকে বেশী প্রভাবিত করে। কিন্তু, কয়েকটি গবেষণার ফলাফল থেকে লকের এ ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি (Evlon, 1967; Mikes and Hulin,1968; Khaleque and Rahman, 1983)।

পাঠসংক্ষেপ

আব্রাহাম মাস্‌লো ১৯৪৩ সালে প্রথম চাহিদা সোপানতত্ব মতবাদটি প্রস্তাব করেন। এ মতবাদের মূল কথা হলো মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তার পেছনে তাঁর অভাববোধ বা চাহিদা কাজ করে। মানুষ কাজের মাধ্যমে তাঁর অভাব বা চাহিদা পূরণ করে থাকে। তাই, মানুষের কর্ম প্রেষণা ও কর্ম আচরণ বুঝার জন্য তাঁর চাহিদাগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।

তিনি মানুষের চাহিদাগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ জৈবিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, স্নেহ-ভালবাসার চাহিদা, সম্ভ্রমের চাহিদা এবং অত্মপূর্ণতার চাহিদা। এ মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যাস করেছেন এবং এগুলোকে চাহিদার সোপান হিসেবে নামকরণ করেছেন।

হার্জবার্গ ও তার সহযোগীগণ ১৯৫৯ সালে যে তত্বটি দাড় করান তাকে হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ব নামে অবহিত করা হয়। তাঁরা পরীক্ষণ পাত্রদের কাঠামগত প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষ্যাৎকার গ্রহণ করেন। তাদের প্রশ্ন ছিল কখন ও কি পরিস্থিতে চাকরি সবচেয়ে ভাল লাগে এবং সবচেয়ে খারাপ লাগে। এ উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারা কর্ম সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত উপাদানগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেন: ১। অর্ন্তনিহিত বা বিষয়গত উপাদান (Intrensic or Content Factor) ২। বাহ্যিক বা প্রেক্ষিত উপাদান (Extrinsic or Context factor)। অর্ন্তনিহিত উপাদনগুলোকে প্রেষণাগত উপাদান (Motivational Factor) আর বাহ্যিক বা প্রেক্ষিত উপাদানগুলোকে স্বাস্থ্যজনিত উপাদান (Hygine Factor) হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মূল্যবোধ তত্বটি বর্ণনা করুন।
২. ন্যায় তত্ব কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আকর্ষণ- প্রত্যাশা তত্বটি বর্ণনা করুন।
২. হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্বটি আলোচনা করুন।
৩. মাসলোর চাহিদা সোপান তত্বটি বর্ণনা করুন।

পাঠ-৪ ঃ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়ন (Developing Achievement Motivation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি-

- কৃতি প্রেষণার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- কৃতি প্রেষণার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন;
- কৃতি প্রেষণার উন্নয়ন কিভাবে করা যায় তা বলতে পারবেন;
- কৃতি পেষণার সাথে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়নের সম্পর্ক বলতে পারবেন;
- রিং টস গেম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে ও বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্বের সংজ্ঞা (Definition of Achievement Motivation Theory)

ম্যাকলিল্যান্ড (Maccleleand) ও তার সহকর্মী এ্যাটকিনসন (Atkeinsion) কৃতি প্রেষণা তত্বের যুগ্নভাবে প্রস্তাব বলে অবহিত করা হয়। ম্যাকলিল্যান্ড কৃতি প্রেষণা তত্ত্বের পথিকৃৎ বলে মনে করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এ তত্ত্বটির বিকাশ, বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় গবেষণা লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে এর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে এ্যাটিকিনসনের অবদান ম্যাকলিল্যান্ডের থেকে আনেক বেশী। এটি মানুষের আত্ন বিশ্বাস, আত্ন পরিচিতি ও আত্নবিকাশ ও স্বীকৃতি লাভের প্রেষণাকে বুঝায়। ম্যাকলিল্যান্ডের সংজ্ঞা অনুসারে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা হলো একটি শিক্ষালব্ধ প্রেষণা যা ব্যক্তিকে উচুমানের কর্মসম্পদনে উৎসাহিত করে।

ম্যাকলিল্যান্ড ও এ্যাটিকিনসনের মতে কোন ব্যক্তির ভিতর নিম্ন লিখিত দুটি পূর্বশর্ত বিদ্যমান থাকলে কৃতিত্বার্জন প্রেষণার উপস্থিত থাকে। যথা:১। ব্যক্তির চেতনা যে, তার কর্মফল কোন মানদন্ড দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে এবং ২। তাঁর বিশ্বাস যে, কোন কর্মের সফলতা বা ব্যর্থতা মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা কমবেশী বিদ্যমান। তবে এ কৃতি প্রেষণা কারো মধ্যে বেশী; আবার কারো মধ্যে কম। যার ভেতর কৃতিত্বার্জন প্রেষণা যত বেশী হবে, সে তত কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী হবে। পক্ষান্তরে, যার মধ্যে কৃতি প্রেষণা কম তার মধ্যে কর্ম সম্পদনের পরিমাণও কম। আবার কৃতিত্বার্জন প্রেষণার মাত্রা অনেকাংশে কারো অতীত কর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল। যদি অতীত কর্ম সাফল্য বেশী থাকে, তার মধ্যে কৃতিত্বার্জন সাফল্যের মাত্রাও বেশী। আবার যে, দেশে উঁচু কৃতি প্রেষণা সম্পন্ন মানুষ যত বেশী, সে দেশ তত বেশী অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করে। আবার, কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সাথে শিল্পোদ্যোক্তার ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান।

এ তত্ত্বটি মূলত তিনটি ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যথা: ১। কোন লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভের দৃঢ়তা, ২। লক্ষ্যের বাঞ্চনীয়তা এবং ৩। কৃতিত্বার্জন প্রেষনার সহায়ক বা প্রতিদন্দ্বী প্রেষণাসমূহের স্থায়িত্ব ও শক্তি। কৃতিত্বার্জন প্রেষণায় একজন মানুষ কাজ করে অন্যের ভয়ে বা প্রশংসার জন্য নয়। মূলত সে কাজ করে কাজটি সাফল্যজনকভাবে করার মাধ্যমে তৃপ্তি লাভের জন্য।

ম্যাকলিল্যান্ড এর মতে কোন ব্যক্তির মধ্যে উচ্চমাত্রায় কৃতিত্বার্জন প্রেষণা প্রতিযোগিতা মূলক কাজে উৎসাহিত করে। কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সে পরিশ্রমী হয় এবং কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সমর্থন প্রয়োগে উৎসাহিত হয়।

একজন উদ্যোক্তা তাঁর সম্পাদিত কাজ সে নিজেই মূল্যায়ন করে। তার জন্য কাজের আদর্শমান স্থাপন করে। বর্তমান কর্ম সম্পাদন নিয়ে তৃপ্তি থাকে না; বরং ঝুঁকি গ্রহণ, করে নতুন নতুন কর্ম সম্পাদনের জন্য এগিয়ে যান। এটি একটি শিক্ষণীয় প্রেষণা, যা কোন ব্যক্তিকে উচুমানের কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী করে।

কৃতিত্বার্জন প্রেষণার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Achievement Motivation)

ম্যাকলিল্যান্ড ও অন্যদের গবেষণা থেকে দেখাযায় যে, যার কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উচুমানের তাঁর কর্ম আচরণের মধ্যে নিম্নরূপ প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:

১. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উচ্চ হলে সে ব্যক্তি তার ধ্যানধারণায় ও চিন্তাচেতনায় এমন সব বস্তু বা ঘটনা বেছে নেয়, যাতে সফলতা নৈপূণ্য ও উৎকর্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

২. তার মধ্যে অনুসন্ধাণ প্রিয় ও মর্যাদার অন্বেষণকারী হয়ে থাকে। সে উচুমানের কাজ করার জন্য ও কাজের মান উচু করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে।

৩. সে কখনও অন্যের ভয়ে বা অন্যের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে কাজ কর না। সে শুধু কাজ করার তৃপ্তির জন্য কাজ করবে।

৪. সে সাহসী, অভিজান প্রিয় ও মডারেট ঝুঁকি গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত থাকবে।

৫. সময় সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকে। যথা সময়ে কর্ম সম্পাদন পছন্দ করে।

৬. সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ আশাবাদী।

৭. যে সকল ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে সে ক্ষেত্রে কাজ করতে বেশী আগ্রহী থাকে।

৮. কৃতিপ্রেষণা একটি শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বিধায় উচুমানের কৃতি প্রষণার অধিকারীরা নতুন নতুন জ্ঞান আন্বেষণে স্বচেষ্ট থাকে।

৯. কৃতিত্বার্জন প্রেষণাপূর্ণ ব্যক্তিগণ স্বাধীনচেতা হয়। যে কাজগুলো নিজের প্রচেষ্টায় করা সম্ভব, সেগুলো পচ্ছন্দ করে এবং যোগ্য লোকদের উপযুক্ত স্থানে নির্বাচন করে।

তাই বলা যায় যে, কৃতি প্রেষণাপূর্ণ ব্যক্তিগণ ঝুঁকি গ্রহণ, নতুন নতুন কাজে আগ্রহী, নিজের তৃপ্তির জন্য কাজ করে, সময় সম্পর্কে অধিক সজাগ থাকে, তাঁরা অন্যের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে না, সর্বদা কর্ম ব্যস্ত থাকে। এ ধরণের লোক যে সমাজে যত বেশী, সে সমাজ অর্থনৈতিকভাবে তত বেশী উন্নত। আর এ ধরণের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকরাই উদ্যোক্তা হিসেবে সফলতা লাভ করে।

উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণায় প্রভাবসৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ
(Factors Related to High Achievement Motivation)

ম্যাকলিল্যান্ড ও তার সহকর্মীদের গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত পারিবারিক ও সামাজিক উপাদানগুলো কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত:

১. **শিশুপালন পদ্ধতি:** সুষ্ঠুভাবে শিশু লালনপালন করলে শিশুদের মধ্যে কৃতি প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। যেমন: পিতামাতা যদি শিশুদেরকে ছোট সময় থেকেই সাবলম্বী করে গড়ে তুলে, স্বাধীনভাবে কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেয় এবং উচুমানের কর্মসম্পাদন দাবী করে, তবে এ সকল শিশুদের মধ্যে উচু কৃতি প্রেষণা সৃষ্টি হয়। আবার শিশুদের প্রতি বাবা মায়ের আচরণ যদি যুক্তিপূর্ণ, উদার ও গতিশীল হয় তাহলেও শিশুদের মধ্যে উচুমানের কৃতি প্রেষণা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, শিশুদের প্রতিবেদনশীল, ও ভাগ্যবাদী বাবা মায়ের সন্তানেরা উচুমানের কৃতি প্রেষণার অধিকারী হয় না।

২. যে সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাসে ঐতিহ্যে কৃতিত্বের উপর জোর দেয়া হয়, সে সমাজের লোকদের মধ্যে কৃতি প্রেষণা বেশী থাকে।

৩. যে সমাজে মানুষের চিন্তা, কর্মে ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে সে সমাজের লোকদের মধ্যে উচুমানের কৃতি প্রেষণা বেশী থাকে। পক্ষান্তরে,যে সমাজে মানুষের মধ্যে চিন্তা, কর্মে ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না পেলে সে সমাজের মানুষের মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণার মান নিচু থাকে।

৪. যে সমাজের প্রতিযোগিতার সুযোগ যত বেশী, সে সমাজে মানুষের মধ্যে কৃতি প্রেষণা তত উচু মানের হবে। পক্ষান্তরে, সমাজে প্রতিযোগিতাকে নিরৎসাহিত করা হলে সেখানে কৃতিপ্রেষণা কম হবে।

৫. যে সমাজে উচ্চ মানের কাজের জন্য প্রশংসা, পুরুস্কার ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা থাকে, সেখানে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উচুমানের থাকে।

৬. যে সমাজে সৃজনশীল কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা করা হয়, সে সমাজে কৃতিত্বার্জন প্রেষণার মান বেশী থাকে।

কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের কৌশল
(Techniqes of Improving Achievement Motivation)

কৃতিত্বার্জন প্রেষণা একটি শিক্ষালবদ্ধ বিষয়। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়ন করা সম্ভব। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সাথে কর্ম সম্পাদনের ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। তাই একজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যে উচুমানের

কৃতিপ্রেষণা থাকা প্রয়োজন। ম্যাকলিল্যান্ড ও তার সহযোগীগণ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উন্নয়নের জন্য কিছু কৌশল বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপঃ

১. **বাস্তব ভিত্তিক চিন্তাকরা:** কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তব ভিত্তিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য চিন্তাকরার অভ্যাস গড়ে তোলা। তাই কোন লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বে এ লক্ষ্য অর্জনের ফলাফল, সুবিধা-অসুবিধা, বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব থেকেই চিন্তা করা, যাতে করে লক্ষ্য অর্জনে সমস্যার সৃষ্টি না হয়। তাই কোন লক্ষ্য স্থির করার পূর্বে নিজস্ব চিন্তা ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃতি প্রেষণা বৃদ্ধি করা যায়।

২. **কার্যকরভাবে সমস্যার বিশ্লেষণ করা:** লক্ষ্য নির্ধারণের পর তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি সমস্যার সম্মুক্ষীণ হয়, তবে তা সুচিন্তিতভাবে ও কিছু কৌশল অবলম্বন করে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা। এ ধরণের কিছু কৌশল নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

   ক) **পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া:** কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা কজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করলে তা বাস্তব ভিত্তিক হবে।

   খ) **সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা:** কোন সমস্যা দেখা দিলে, সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে সমাধানের বিভিন্ন উপায়গুলো চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন বিকল্প উপায়গুলো মূল্যায়ন পূর্বক উত্তম সমাধানটি নির্বাচন করা।

   গ) **সিদ্ধান্তগ্রহণে তাড়াহুড়া না করা:** তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করলে সিদ্ধান্ত সঠিক ও পরিপক্ক না হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ধীরস্থির ভাবে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। তার ফলে, সিদ্ধান্তে ভুলের মাত্রা কম হয়।

   ঘ) **অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণ:** কোন সমস্যা জটিল মনে হলে অবিজ্ঞ ও বিজ্ঞ লোকের নিকট থেকে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। এ ধরণের পরামর্শের ফলে ভাল ও যুক্তিযুক্ত সমাধান আশাকরা যায়।

   ঙ) **আগ্রহবোধ সৃষ্টি:** সমস্যার প্রতি আগ্রহ জাগ্রত করতে হবে। এর ফলে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সমস্যার প্রকৃত সমাধান বের করা সম্ভব হয়।

   চ) **বিকল্প সমাধান নির্ধারণ:** সবসময়ই একটি সমস্যার একাধিক বিকল্প হাতে রাখা উচিত। কারণ, আপনি একটি সমস্যার একটি মাত্র সমাধান রাখলেন, বাস্তবতার কারণে তা প্রয়োগ করা সম্ভব হলো না; সেক্ষেত্রে আপনার হাতে করণীয় কিছুই থাকল না। তাই এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

   ছ) **নির্বাচিত সমাধানের মূল্যায়ন:** যে সমাধান বের করা হলো তা বিশ্লেষণ করে, সুবিধা-অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করণ ও প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ করা। ভুলত্রুটি থাকলে যাতে আগেথেকেই সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। পাশাপাশি অন্যান্য বিকল্পগুলোও অনুরুপভাবে মূল্যায়ন প্রয়োজন।

   জ) **বিরতি গ্রহণ:** সমস্যা জটিল হলে মাঝে বিরতি দিলে পূন:চিন্তা করার সুযোগ হয় এবং নতুনভাবে সমস্যার গভীরে যাওয়া যায়। ফলে একটানা সমস্যা সমাধান না করে প্রয়োজনে মাঝে রিরতি দেয়া যেতে পারে।

   ৩. **লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন:** লক্ষ্য অর্জন করতে হলে তা কখন কি ভাবে করা যাবে, সে সম্পর্কে পূর্বপরিকল্পনা থাকা উচিত। পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আবার সময় সময় পরীক্ষা করা উচিৎ কিভাবে লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে। এভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়া যাবে।

৪. **আত্নবিশ্বাস নিয়ে কাজ করা:** নিজের উপর আত্নবিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্ন বিশ্বাস মানুষকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আত্নবিশ্বাস থাকলে ঝুঁকিগ্রহণ, নতুন কিছু সৃষ্টি ও বড় ধরণের কাজ করা সম্ভব। তাই যে কোন কাজ শুরুর প্রথমেই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা উচিৎ। তাতে মনোবল বৃদ্ধি পায় ও কাজে গতি আসে। এভাবে কৃতিপ্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

৫. **প্রয়োগিক কৌশল:** কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু কিছু প্রায়োগিক কৌশল অবলম্বন প্রয়োজন হয়। নিম্নে কৃতিপ্রেষণা উন্নয়ন বা বৃদ্ধিতে কিছু প্রায়োগিক কৌশল বর্ণনা করা হলো:

   ক) **TOWS মেট্রিক্স বিশ্লেষণ:** TOWS বলতে Threats (ভীতি) Opportunities (সুযোগ) Weakness (দূর্বলতা) Strength (শক্তি) কে বুঝায়। গবেষণায় থেকে দেখা যায় যে, উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণাসম্পন্ন উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা সাধারণ মানুষদের মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে শ্রেষ্টত্ব অর্জন করা, অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা, নতুন কিছু করা, ঝুঁকি গ্রহণ করা ইত্যদি। এ গুলো মানুষিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; আর এ ধরণের মানষিকতায় যন্ত্রনা বেশী হলে কোন

কাজে সফল হবার সম্ভাবনা কমে যায়। এজন্যই TOWS এর চর্চা থাকা প্রয়োজন। যাতে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে শক্তি ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সফলতা অর্জন করা যায়।

খ) **কাহিনী বর্ধিতকরণ অভিক্ষা:** ম্যাকলিল্যান্ড তার কিছু প্রতিবেশীদের মধ্যে উচ্চাভিলাষী ও প্রেষণা পরিমাপ করার জন্য কিছু দূর্বোধ্য ছবি দিয়ে তার বর্ণনা করতে বলেন এবং তা মূল্যায়ন করে রেটিং করেন। তারপর তাদেরকে কিছু জটিল ধরণের ছবি দিয়ে তা দিয়ে কাহিনী লিখতে বলেন এবং তা মূল্যায়ন করে পৃথক রেটিং করেন। তাদেরকে আরো ভাল করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এখানে যারা ভাল করেছে, পরে তারা আরো ভাল করেছে। এভাবে তাদের মধ্যে কৃতি প্রেষণার উন্নয়ন ঘটান।

অভিনয় পদ্ধতি

অভিনয় পদ্ধতিতে কিছুলোককে নিয়ে কয়েকজন করে কয়েকটি দল গঠন করে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন কিছু তৈরি করতে বলা হয়। যেমন: ইমারত, শহীদমিনার, স্মৃতি সৌধ ইত্যাদি। প্রতিটি দল তারা নিজ নিজ সদস্যদের নিয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে প্রশিক্ষককে দেখাবেন এবং প্রশিক্ষক তা মূল্যায়ন করে রেটিং করবেন। এভাবে ছোটখাটো কিছু কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বৃদ্ধি পাবে।
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখাযায় যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা একটি শিক্ষা লব্ধ গুণ যা প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে বিকাশ ঘটানো যায়।

শিল্পোদ্যোক্তা ও কৃতিত্বার্জন প্রেষণার সম্পর্ক
(Relationship Between Entrepreneureship and Achievement Motivation)

শিলোদ্যোক্ততা বলতে যিনি নতুন কিছু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করে সময় ও অর্থ ব্যয় করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো।

সাধারণ অর্থে নতুন কিছু ধারণা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ ও সে অনুযায়ী কাজ করাই হলো উদ্যোগ। পক্ষান্তরে কৃতি প্রেষণা হলো মানুষ কাজ করবে তার কাজের সফলতা অর্জনের জন্য। এ কাজ করার সফলতাই তাকে তৃপ্ত করবে। আর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য কৃতিত্বার্জন প্রেষণা থাকতে হবে। ম্যাকলিল্যান্ড বলেন, যে সমাজে বা যার মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা উচুমানের, তার মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণে প্রবনতাও উচু মানের। তাই কারো মধ্যে কৃতিপ্রেষণা না থাকলে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না। যে সমাজে যত বেশী উচ্চ মানের কৃতি প্রেষণাসম্পন্ন মানুষ থাকে, সে সমাজে তত বেশী উদ্যোক্তা দেখ যাবে। তাই উদ্যোক্তা উন্নয়নের সাথে কৃতি প্রেষণার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

ম্যাকলিল্যান্ড আরো বলেন যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে উচ্চ মাত্রার কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তাকে প্রতিযোগীতামূলক উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে। উদ্যেগটি সম্পন্ন করার জন্য বেশী পরিশ্রম করে এবং কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সামর্থ প্রয়োগে উৎসাহিত করে। এক কথায় এটা বলা যায় যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা একজন উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গ্রহণে প্রনোদিত করে থাকে। তাই শিল্পোদ্যোক্তা ও কৃতিত্বার্জন প্রেষণার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

রিং-টস গেম (Ring-Toos Game)

এটি একটি কৃতি প্রেষণা পরিমাপক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মধ্যে কৃতিপ্রেষণার মাত্রা পরিমাপ করা যায়। এ খেলার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে উলম্ব কৌনিকভাবে চার ইঞ্চি উচ্চতার কতগুলো দন্ড থাকে এবং লোহার একটি রিং এর মাধ্যমে লক্ষ্য ভেদ করার খেলা। রিং ছুরে মারার জন্য কিছু দূরুত্ব দেয়া থাকে। যেমন: কাছাকাছি দূরত্ব, মাঝারী দূরত্ব, এবং দূরবর্তী দূরত্ব। যে ব্যক্তি কম ঝুঁকি নিতে চান তিনি কাছাকাছি দূরত্ব থেকে রিং ছুড়বেন, আর যিনি বেশী ঝুঁকি নিতে চান তিনি দূরবর্তী দূরত্ব থেকে রিং ছুড়বেন। এ ক্ষেত্রে যিনি মাঝারী দূরত্ব থেকে রিং ছুড়ে বেশী সফলতা অর্জন করবেন তাঁর মাঝেই বেশী কৃতিত্বার্জন প্রেষণা রয়েছে। কারণ, কৃতি প্রেষণার বৈশিষ্ট্যে আমরা দেখেছি যে, এক জন কৃতিত্বার্জন প্রেষণাসম্পন্ন মানুষ পরিমিত ঝুঁকি নিয়ে বেশী সফলতা অর্জন করে। কৃতিপ্রেষিত মানুষ কখনও অতিরিক্ত ঝুঁকি বহন করে না।

এ পদ্ধতির বড় সুবিধা হলো অত্যন্ত কম সময়ে ও সবচেয়ে কমখরচে কৃতি প্রেষণা পরিমাপ করা যায়। এ পদ্ধতিটি একেবারেই সহজ। যে কেউ এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে এবং অল্প সময়ে ও কমখরচে অনেক লোকের কৃতি প্রেষণা

পরিমাপ করা যায়। তবে, এ পদ্ধতিটি তেমন কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতাও কম। তার পরও এটা দ্বারা একজন মানুষের মধ্যে ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রবনতা ও কৃতিপ্রেষণা সম্পর্কে মোটামোটি একটা ধারণা পাওয়া যায়।

পাঠসংক্ষেপ

কোন ব্যক্তির ভিতর নিম্ন লিখিত দুটি পূর্বশর্ত বিদ্যমান থাকলে কৃতি প্রেষনার উপস্থিত থাকে। যথা:১। ব্যক্তির চেতনা যে, তার কর্মফল কোন মানদন্ড দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে এবং ২। তাঁর বিশ্বাস যে, কোন কর্মের সফলতা বা ব্যর্থতা মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কৃতি প্রেষণা কমবেশী বিদ্যমান। ম্যাকলিল্যান্ড ও তার সহযোগীগণ কৃতি প্রেষণা উন্নয়নের জন্য কিছু কৌশল বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ: বাস্তব ভিত্তিক চিন্তাকরা, কৃতি কার্যকরভাবে সমস্যার বিশ্লেষণ করা,পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা,সিদ্ধান্তগ্রহণে তাড়াহুড়া না করা,অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণ,আগ্রহবোধ সৃষ্টি প্রভৃতি ।

রিং-টস গেম একটি কৃতি প্রেষণা পরিমাপক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে একজন ব্যক্তির মধ্যে কৃতিপ্রেষণার মাত্রা পরিমাপ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কৃতিপ্রেষণা তত্বের সংজ্ঞা দিন।

২. কৃতিপ্রেষণার বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি ?

৩. শিল্পোদ্যোক্তা ও কৃতিপ্রেষণার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৩. রিং-টস গেম কি ?

৪. পরিমিত ঝুঁকি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উচ্চ কৃতি প্রেষণার প্রভাবসৃষ্টিকারী উপাদনসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২. কৃতি প্রেষণা উন্নয়নের কৌশল বর্ণনা করুন

পাঠ-৫ ঃ SWOT বিশ্লষণ (SWOT Analysis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- SWOT বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোগে SWOT এর ব্যবহার বলতে পারবেন;
- SWOT বিশ্লেষণের উপাদানগুলো জানতে ও বলতে পারবেন;
- SWOT বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া বলতে পারবেন;
- SWOT বিশ্লেষণের দূর্বলতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

SWOT বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৌশলগত ব্যবস্থাপনার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য সাধারণত যে সকল মডেল ব্যবহৃত হয় SWOT বিশ্লেষণ কৌশলটি তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত, উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয়। SWOT হচ্ছে এক ধরণের তালিকা বা মেট্রিক্স, যা কোন প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত। যেমনঃ S = Strength (শক্তি) W = Weakness (দূর্বলতা), O = Opportunity (সুযোগ) এবং T = Threat (ভীতি)। প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানগুলো কি ধরণের প্রভাববিস্তার করে তা জানার জন্যই মূলত SWOT বিশ্লেষণ করা হয়। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তি, দূর্বলতা, সুযোগ ও ভীতি এ চারটি উপাদান চিহ্নিত করে এগুলোর মাধ্যমে ভারসাম্য আনা যায়।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও দূর্বলতাগুলো সনাক্ত করা যায়; পক্ষান্তরে, বাহ্যিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে সুযোগ ও হুমকিসমূহ সনাক্ত করা হয়। তাই ব্যবসায় পরিচালনা করার লক্ষ্যে একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে তার ব্যবসায়ের সুযোগ, শক্তি, দূর্বলতা ও ভীতিসমূহ সনাক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিকেই SWOT বিশ্লেষণ বলা হয়। এতে একজন শিল্পোদ্যোক্তা সঠিক ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করতে পারে।

শিল্পাদ্যোগে SWOT এর ব্যবহার
(Application of SWOT in Entrepreneureship)

একজন শিল্প-উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ের পণ্য নির্বাচন, বাজারজাত করণ, অর্থসংস্থান ও রণকৌশল নির্ধারণের জন্য SWOT বিশ্লেষণ উত্তম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ের যে বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে হবে তার ক্ষমতা, দূর্বলতা, সুযোগ ও ভীতি পূর্ব থেকেই অবগত হতে হবে। SWOT ব্যবসায়ের কৌশলের কর্ণার স্টোন (Corner Stone) হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করা যায়। এটা কোম্পানীর দূর্বলতা সমূহ দূরীকরণে সাহায্য করে, এবং বাহ্যিক সুযোগগুলো ব্যবহার করতে পারে, এবং ভীতিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

SWOT বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া
(Process of SWOT Analysis)

SWOT বিশ্লেষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ কাজের জন্য সর্বপ্রথম সমস্যাটিকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও দূর্বলতা এবং বাহ্যিক সুযোগ ও হুমকি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে বিচার করা অপরিহার্য। SWOT বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও দূর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করণঃ** SWOT বিশ্লেষণের প্রাথমিক ধাপ হলো কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ শক্তি ও দূর্বলতা চিহ্নিত করণ, অভ্যন্তরীণ শক্তি বলতে প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনশক্তি, সুনাম, উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি, আধুনিক প্লান্ট ও মেশিনারী, প্রাপ্ত ইমেজ, ইত্যাদি কে বুঝায়। পক্ষান্তরে দূর্বলতা বলতে যা কিছুর অভাব রয়েছে। যেমনঃ দক্ষ ও কমিটেড জনশক্তির অভাব, সুনাম কম, মূলধনের স্বল্পতা, সেকেলে মেশিন পত্র, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বুঝায়। সঠিকভাবে সবল ও দূর্বল দিকগুলো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

অনেক সময় আভ্যন্তরীণ দূর্বলতাকে চেপে রাখা হয়, যা ক্ষতিকারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ দূর্বলতা বের করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যায়:

ক) **ব্যবসায়ের ধারা:** SWOT বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যবসায়ের প্রতিটি ধাপকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। কর্মীদের দক্ষতা ও কমিটমেন্ট, মূলধন প্রবাহ, উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে প্রতিটি ক্ষেত্রে দূর্বলতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। আবার ব্যবসায়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদনগুলোর সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করলেও ব্যবসায়ের দূর্বলতা বের হয়ে আসবে। বাস্তবে নিজ ব্যবসায়ের দূর্বলতা চিহ্নিত করা কঠিন কাজ।

খ) **উপকরণ বিশ্লেষণ:** ব্যবসায় পরিচালনার জন্য মূলধন, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, উন্নত প্রযুক্তি, প্রভৃতি যথেষ্ট আছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এগুলো যথেষ্ট ও যথার্থ না হলে প্রতিযোগিতায় ভাল ফল লাভ করা যাবে না। তাই ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ বিশ্লেষণ করে কোন ঘাটতি আছে কি না তা নির্নয় করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, নিজেদের উপকরণের সাথে প্রতিযোগীদের উপকরণের তুলনা করে দেখতে হবে যে, উপকরণের দিক থেকে প্রতিযোগীদের তুলনায় নিজেদের অবস্থা সবল না দূর্বল।

গ) **সংগঠনের সাংস্কৃতি:** সংগঠনের সাংস্কৃতি ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসরণ, সুষ্ঠু নিয়ম কানুন, কর্মে স্বাধীনতা, কাজের মূল্যায়ন, ক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি কোম্পানীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। সংগঠনের মধ্যে যদি ইতিবাচক সাংস্কৃতি থাকে তাতে মানুষ কাজে উৎসাহিত হয় ও ভাল কার্য সম্পাদন করে। তাই সংগঠনের নীতি, শ্রমিকদের সাথে মালিকদের সম্পর্ক, কর্মীদের প্রতি ন্যায় বিচার, শৃঙ্খলা ইত্যাদির অভাব প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ) **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা:** পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সাফল্য নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। পরিকল্পনা উন্নয়নের পাশাপাশি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, তা না হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কঠিন হয়ে পাড়ে।

২. **বাহ্যিক সুযোগ ও হুমকিসমূহ:** যে উপাদনাগুলো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন: জনসংখ্যা, চাহিদা, সরকারী নীতি; প্রতিযোগীদের সংখ্যা, বাজার, সরবরাহ, বিকল্প পণ্য ইত্যদি। এ উপাদনগুলো কোন ব্যবসায়ের পক্ষে বা বিপক্ষে যেতে পারে। পক্ষে হলে সুযোগ, আর বিপক্ষে হলে হুমকি। এ সকল বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবসায়ের সুযোগ ও হুমকি চিহ্নিত করতে হয়। নিম্নে এধরণের বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো:

ক) **শিল্প পরিবেশ:** বিভিন্ন প্রকার জরিপ, বাজার গবেষণা, ট্রেড জার্নাল, বিভিন্ন কোম্পানীর রির্পোট ইত্যাদি থেকে শিল্প পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এ গুলো পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে সুযোগ ও হুমকি চিহ্নিত করা যায়: এ বিষয় গুলো হলো, প্রযুক্তির পরিবর্তন, শিল্পকৌশল পরিবর্তন, শিল্পনীতির পরিবর্তন, অর্থায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন, নতুন পণ্য উদ্ভাবন, বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন, ভোক্তাদের রুচির পরিবর্তন প্রভৃতি।

খ) **প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশ:** সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাকে বিবেচনা করে সুযোগ ও হুমকি নিরুপণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যায়:

প্রতিযোগীদের অবস্থা, প্রতিযোগীদের পরিমাণ, বিকল্প পণ্য, নতুন প্রতিযোগীদের আগমনের হার ইত্যাদি।

৩. **সাধারণ পরিবেশ:** অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে সাধারণ পরিবেশ বলা হয়। অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে মুদ্রা নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা, জাতীয় উৎপাদন, প্রবৃদ্ধির হার ইত্যাদি। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষের রুচি, ধর্মীয় অনুভূতি ইত্যাদি। আর রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে সরকারের স্থিতিশীলতা, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্ক, ইত্যাদি। এগুলো ব্যবসায়ের পক্ষে অথবা বিপক্ষে হতে পারে। সাধরণ পরিবেশের উপাদনগুলো কোন কারবারের পক্ষে হলে তা সুযোগ এবং বিপক্ষে হলে তা হুমকি হিসেবে গণ্য হবে।

সুযোগ ও হুমকিকে নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ এবং শক্তি ও দূর্বলতাকে সাধারণ, গৌণ, এবং জটিল বলে নিরুপণ করা যায়। এরপর প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত রেটিংগুলো কাঠামো অনুসারে সাজিয়ে পুর বিষটি বিশ্লেষণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আনেকগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়। এ ধরণের প্রশ্নের কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া হলো:

ক. প্রতিষ্ঠানের শক্তি কি পরিমাণ?
খ. প্রতিষ্ঠানের শক্তিগুলো পুরপুরী ব্যবহৃত হচ্ছে কি না?
গ. প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতারধরণ কেমন এবং তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব কতটুকু?
ঘ. প্রতিষ্ঠানের শক্তি দ্বারা বাহ্যিক সুযোগগুলোর সৎব্যবহার করা যাবে কি?
ঙ. প্রতিযোগীদের দূর্বলতা কি এবং সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের শক্তি দ্বারা তা থেকে সুবিধা অর্জন করা যাবে কি না?
চ. বাহ্যিক কি ধরণের হুমকি আছে এবং তা প্রতিরোধ করা সম্ভব কি না?

এ ধরণের বহুসংখ্যক প্রশ্ন তৈরি করে তার উত্তর পর্যালোচনা করে তার উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিযোগী পরিবেশে সুবিধা ভোগ করে সাফল্য অর্জন করা যায়।

SWOT বিশ্লেষণ মেট্রিক্স (SWOT Analysis Matrix)

SWOT বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্যই হল প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানসমূহের বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত কর্ম পদ্ধতির স্থিরিকরণ। নিম্নোক্ত ছকে বাহ্যিক পরিবেশের সুযোগ (Opportunity) ও হুমকি (Threat) এবং আভ্যন্তরীণ পরিবেশের শক্তি (Strength) ও দুর্বলতা (Weakness) বিশ্লেষণের মাধ্যমে চারটি সম্ভাব্য ভবিষ্যত কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হল-

আভ্যন্তরীণ উপাদান / বাহ্যিক উপাদান	**আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ (S)** •প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা • আর্থিক সামর্থ • বাজারজাতকরণ সামর্থ • গবেষণা ও উদ্ভাবন সামর্থ • জ্ঞান বা শিক্ষা ইত্যাদি	**আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ (W)** • মূলধনের অভাব • ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণের সামর্থের সীমাবদ্ধতা • উদ্ভাবনী জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি।
বাহ্যিক সুযোগসমূহ (O) • ঋণের সহজলভ্যতা • প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি • স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি • নতুন পণ্য বা সেবার উদ্ভাবন • অনুকুল রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থা • নতুন প্রযুক্তি ইত্যাদি।	**SO কর্মকৌশল ঃ** Maxi-Maxi সবচেয়ে শক্তিশালী সাফল্যজনক কর্মকৌশল। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিসমূহকে ব্যবহার করে বাহ্যিক সুযোগ সুবিধা কাজে লাগানো হয়।	**WO কর্মকৌশল ঃ** Mini-Maxi এরূপ পরিস্থিতিতে বাহ্যিক সুযোগ সুবিধাসমূহকে কাজে লাগানোর নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণে উন্নয়নমূলক কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়।
বাহ্যিক ভীতিসমূহ (T) • রক্ষণশীল ঋণদান নীতি • কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা • তীব্র প্রতিযোগিতা • অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা • চাহিদার পরিবর্তনশীলতা • রক্ষণশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা ইত্যাদি।	**ST কর্মকৌশল ঃ** Maxi-Mini এরূপ পরিস্থিতিতে বাহ্যিক হুমকির মোকাবেলা বা তা এড়ানোর জন্য আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহকে কাজে লাগানো হয়।	**WT কর্মকৌশল ঃ** Mini-Mini এরূপ পরিস্থিতিতে কর্মী ছাটাই, কোম্পানির অবসায়ন অথবা অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ-উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১) WT কর্মকৌশল (WT Stretegy) ঃ নীচের ডানদিকে অবস্থিত WT কৌশল সাধারণত আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য এবং বাহ্যিক হুমকি এড়ানোর জন্য করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কোম্পানি খরচ কমানোর জন্য কর্মী ছাঁটাই করে অথবা অন্য কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগ স্থাপন করে, নয়তো কোম্পানির বসায়ন করা হয়।

(২) WT কর্মকৌশল (WO Strategy) ঃ উপরে ডান দিকের WO কৌশলের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে কাটিয়ে বাহ্যিক পরিবেশের সুযোগসমূহকে কাজে লাগানো প্রচেষ্টা চালানো হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দুর্বল বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করে তা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

(৩) ST কর্মকৌমল (ST Strategy) ঃ ST কর্মকৌশলের ক্ষেত্রে বাহ্যিক পরিবেশের হুমকিসমূহকে আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ দ্বারা মোকাবিলা করা হয়। এ পর্যায়ে কোম্পানি তার নিজস্ব প্রযুক্তিগত, উদ্ভাবনমূলক, আর্থিক, ব্যবস্থাপকীয় ও বাজারজাতকরণ সামর্থের মাধ্যমে প্রতিযোগী ফার্মের পণ্যের উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণজনিত হুমকি মোকাবেলা করে থাকে।

(৪) SO কর্মকৌশল (SO Strategy) ঃ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঙ্খিত এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক পরিবেশের সুযোগসমূহকে কাজে লাগানোর জন্য আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহকে ব্যবহার করা হয়। এ পর্যায়ে কোম্পানিসমূহ তাদের দুর্বলতাসমূহ অথবা বাহ্যিক হুমকিসমূহকে দূর করে বা এড়িয়ে সর্বোচ্চ সুযোগ অর্জন করতে সচেষ্ট হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে SWOT বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি পরিবেশ বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

পাঠসংক্ষেপ

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৌশলগত ব্যবস্থাপনার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য সাধারণত যে সকল মডেল ব্যবহৃত হয় SWOT বিশ্লেষণ কৌশলটি তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত, উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয়। SWOT হচ্ছে এক ধরণের তালিকা বা মেট্রিক্স, যা কোন প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত। যেমনঃ S = Strength (শক্তি) W = Weakness (দূর্বলতা), O = Oportunity (সুযোগ) এবং T = Threat (ভীতি)। প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানগুলো কি ধরণের প্রভাববিস্তার করে তা জানার জন্যই মূলত SWOT বিশ্লেষণ করা হয়। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তি, দূর্বলতা, সুযোগ ও ভীতি এ চারটি উপাদান চিহ্নিত করে এগুলোর মাধ্যমে ভারসাম্য আনা যায়।

SWOT বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার স্তরগুলো হলোঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও দূর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করণ, ব্যবসায়ের ধারা, উপকরণ বিশ্লেষণ, সংগঠনের সাংস্কৃতি
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা, সাধারণ পরিবেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.শিল্পাদ্যোগে SWOT বিশ্লেষণ কাকে বলে?
২.শিল্পাদ্যোগে SWOT এর ব্যবহার লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১.শিল্পাদ্যোগে SWOT বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

পাঠ-৬ ঃ শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে সহযোগিতারধরণ ও উৎসসমূহ (Types and Sources of Assistance for Entrepreneural Development)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি-

- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের সহযোগিতার ধারণগুলো বলতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের সরকারী উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের বেসরকারী উৎস সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সাহায্যের উৎসসমূহ (Sources of Assistance)

একজন উদ্যোক্তার বিভিন্নধরণের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এগুলো দুটি উৎস থেকে পায়। যথা ১। সরকারী সাহায্য ও ২। বেসরকারী সাহায্য। তবে আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারই মূখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এদেশের সরকারী সাহায্য সহযোগিতা জটিল ও কষ্ট সাধ্য। বেসরকারী খাতে শিল্পোদ্যোগের সাহায্য সহযোগিতার পরিমাণ খুবই কম। তবে, অধুনা বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে বেশ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সারকার বেশ কিছুনীতি গ্রহণ করেছে যেমন: শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্ব নীতি, রপ্তানি নীতি, বিভিন্ন প্রকার অবকাঠাম সুবিধা প্রদানের নীতি প্রভৃতি।

শিল্প নীতি: যে কোন দেশের শিল্প নীতি সে দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ দেশে ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৯ ও সর্বশেষ ২০০৫ সালে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখলে, দেশীবিদেশী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে। বিভিন্ন সুবিধা প্রদান বিশেষ করে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ প্রণোদনা মূলক ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে ব্যবসায়িক পরিবেশ অধ্যায়ে ২০০৫ সালের শিল্পনীতির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে বলে এখানে এবিষয়ে আর বেশী আলোচনা করা হলো না।

সাহায্যের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ (Institutional Sources of Assistance)

শিল্পোদ্যোক্তাদের সাহায্য করার লক্ষ্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে মালিকানার ভিত্তিতে ২ভাবে ভাগ করা যায়। যথা: ১। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ২। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Public Institutions) : সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমূহের নিম্নে বর্ণনা দেয়া হলো-

ক) বিনিয়োগ বোর্ড (Board of Investment) : বিনিয়োগ বোর্ড নতুন শিল্প দ্রুত বাস্তবায়নের ও বর্তমান শিল্পেসহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটি প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং মন্ত্রীবর্গ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সচিবগণ নিয়ে এ বোর্ড গঠিত।

বিনিয়োগ বোর্ডে বিনিয়োগকারীদের শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবকাঠামগত সুবিধা দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নক্ত ক্ষেত্রে একক সেবা কেন্দ্র (One Stop Service) সুবিধা প্রদান করবে: বিদুৎ ও গ্যাস সংযোগ, পানি ও পয়:নিষ্কাশন সংযোগ, আমাদানিকৃত যন্ত্রাংশ, এবং কাঁচামালের শুল্ক নিকাশপত্র (কাষ্টম ক্লিয়ারেন্স), পরিবেশ সংস্থার নিকাশপত্র এবং কোন শিল্প দ্রুত স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা ও সেবা প্রদান। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের একক সেবা কেন্দ্র (One Stop Service) এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

খ) বাংলাদেশ উন্নয়নব্যাংক (Bangladesh Development Bank): বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক ও শিল্পঋণ সংস্থা একিভূত হয়ে এখন Bangladesh Development Bank হয়ে কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য প্রদান করতে যাচ্ছে :

- উন্নয়নব্যাংক দেশে নতুন শিল্প স্থাপনে এবং পুরাতন শিল্প উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে।
- উন্নয়নব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের স্টক, ডিবেঞ্চার, ঋণপত্র ইস্যু করার ক্ষেত্রে দায় গ্রহণ করে থাকে।
- উন্নয়নব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে বিনিময়বিলসহ অন্যান্য হস্তান্তরযোগ্য দলিল ক্রয় বিক্রয় ও বাট্টা করে থাকে।

- এ ব্যাংক বিনিয়োগকারীগণ কতৃক অন্যান্য সূত্র হতে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- উন্নয়নব্যাংক প্রকল্প নির্বাচনে, বাস্তবায়নে ও পরিচালনায় বিনিয়োগকারীদের কারিগরি পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। শিল্প ব্যাংক পাট শিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, কাগজশিল্প, মুদ্রণশিল্প, চামড়াশিল্প, সারশিল্প, খাবারশিল্প ইত্যাদি শিল্প স্থাপন ও ঋণ প্রদানে সাহায্য করে আসছে।
- তালিকাভূক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোকে সুষমকরণ ও আধুনিকিকরণে আর্থিক সহায়াতা প্রদান করে।
- পাবিলিক লি: কোম্পানীগুলোর অবলিখন, ফাইন্যান্স ইত্যাদিতে আর্থিক সাহায্য করে থাকে।
- সংস্থার তালিকাভূক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোর মধ্যে রুগ্ন প্রকল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পূর্ণবাসন ও নতুনভাবে শুরু করার জন্য আর্থিক সহায়তা করা।
- শিল্পায়ন, গবেষণা ও শিল্প সর্ম্পকিত পরামর্শ প্রদান করা।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য শিল্পখাতগুলো বস্ত্র শিল্প, পাট শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প, ইত্যাদি।

গ) বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (Investment Corporation of Bangladesh): ১৯৭৬ সালে ICB প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিম্নরূপ:

১। বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা। ২। পুঁজি বাজারের উন্নয়নে সহায্য করা। ৩। সঞ্চয়কে উৎপাদন কাজে লাগানো। ৪। পুঁজি গঠনমূলক কাজে সহায়তা করা।

এ সংস্থাটি দেশে শিল্প বিকাশে নিম্নলিখিতভাবে সহায়তা করে থাকে:

১. আন্ডার রাইটিং এর ভিত্তিতে ব্রীজ ঋণ প্রদান করা।
২. শেয়ার বিনিয়োগকারীদের হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ করা।
৩. মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বাজারজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনা করা।
৪. ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় ও তার বিবরণ প্রনয়ন করা। এবং
৫. স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রয়ের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ (Nationalised Commercial Banks of Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে তিনটি সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে যা লি:কোম্পানীতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াধীন। যথা: সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও অগ্রনী ব্যাংক । এ ব্যাংকগুলো সারা দেশে শাখার মাধ্যমে বাৎসরিক চলতি মূলধন প্রদান করার পাশাপাশি নিম্নলিখিত সাহায্যও করে থাকে:
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক শিল্পায়নে অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে সাহায্য করে, কৃষি শিল্প উন্নয়ন, মূলধন গঠন ও ঋণপত্র প্রচলনের মাধ্যমে শিল্লোদ্যোক্তাদের সাহায্য করে থাকে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষিউন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি শিল্পে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক: ১৯৮৬ সালে এ ব্যাংকের জন্ম হয়। এ ব্যাংক রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ন্যয় কৃষি শিল্পে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লি: (Bank of Small Industries and Commerce Bangladesh Ltd. (BISC):
এটি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের মোট প্রদত্ত ঋণের ৫০% ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে বর্তমানে মাইক্র এন্টারপ্রেইজ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা(বিসিক)
(Bangladesh Small and Cottage Industries Corproration)

এ সংস্থাটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহায়তা ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে। এ সংস্থার কার্যাবলী নিম্নরূপ:
এ সংস্থা ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৪ লাক্ষ ও কোম্পানী বা সমবায় সমিতিকে ১৫ লক্ষ্যে টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে।

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করতে সহায়তা দান করে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের সার্বিক সহায়তা করে।

রপ্তানি উন্নয়ন বুরো (Export Promotion Bureau)

এ সংস্থাটি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য মূখ্যভূমিকা পালন করে থাকে। রপ্তানি উন্নয়ন বুরো বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে নিম্নলিখিত কাজগুলো করে থাকে:

- দেশের বাইরে নিজ দেশের পণ্যের প্রচার ও প্রসার করা।
- দেশের বাণিজ্য চুক্তি ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।
- দেশের রপ্তানি নীতি ও রপ্তানির পরিমাণ নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শদান।
- দেশের রপ্তানি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- দেশের রপ্তানি উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (Trading Corporation of Bangladesh. (TCB))

পাকিস্তান আমলে প্রথম ১৯৫৭ সালে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তান সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তী ১৯৭২ সালে এটিকে Trading Corporation of Bangladesh. (TCB) নামকরণ করা হয়। টিসিবি নিম্নক্তভাবে সহায়তা দান করে থাকে:

- সরকারের পক্ষে বৈদেশিক ব্যবসা পরিচালনা করে।
- দেশের বাইরের দেশগুলোর সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি করা।
- বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে বিক্রয় করা।
- বিদেশে পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন
(Bangladesh Standared and Testing Institute)

এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা। দেশী ও বিদেশী বাজারে দেশের উৎপাদিত পণ্য প্রতিয়োগিতায় টিকে থাকতে পারে তার জন্য পণ্যের মান একটি কাম্য স্তরে রাখা।
এ সংস্থাটি নিম্নলিখিত কাজ করে থাকে:

- পণ্য দ্রব্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত আদর্শমান নির্ধারণ করা।
- দেশে ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এসব মানের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- পণ্য দ্রব্য পক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মান চিহ্ন নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা।
- ব্যবসাবাণিজ্যে মান নিয়ন্ত্রণ ও সহজীকরণ ও উন্নতি বিধান করা।

এ সংস্থা জাতীয় ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ৬ টি ডিভিশনাল কার্যালয় গঠন করেছে। যা নিম্নরূপ: কৃষি ও খাদ্য, কেমিক্যালস, ইলোকট্রিক্যাল, পাট ও বস্ত্র, বিল্ডিং সরঞ্জামাদী ও ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামাদী।

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (Controller of Import and Exports)
এ দপ্তরটি ব্যবসা বাণিজ্যে উদ্যোক্তাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে সহায়তা দান করে।

- পণ্য আমদানির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের লাইসেন্স প্রদান।
- দেশে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদন।
- উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, ও খুচরা যন্ত্রাংশ প্রভৃতি আমদানির লাইসেন্স প্রদান।
- পণ্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানি নিবন্ধন পত্র প্রদান করা।
- উদ্যোক্তাদের আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সহায়তা দান করা।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য কেন্দ্র (বিটাক)
(Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre-BITAC)
বাংলাদেশে নতুন শিল্প স্থাপন এবং উন্নয়নে এ সংস্থাটি নিম্নক্তভাবে সহায্য করে থাকে:

- শিল্পে উৎপদনশীলতা বৃদ্ধি করণ।
- প্রকাশনা, সেমিনার, আলোচনা, প্রদর্শন, ইত্যাদির মাধ্যমে উদোক্তাদেরকে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়া।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
(Bangladesh Council of Scientific and Induatrial Research -BCSIR)
এ পরিষদ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা ক্ষেত্রে নিম্নক্তভাবে সহায়তা দান করছে:

- নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্পর্কে ধারণা দেয়া।
- নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া এবং পরিষদের উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের ধারণা দেয়া।
- দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও প্রসার ঘটান।
- কোন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।
- উদ্যোক্তাদের গবেষণামূলক তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি ভাবে এ পরিষদটি ১৯৭৩ সাল থেকে শিল্পে সহায়তা করে আসছে।

বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভোলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) এবং রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (REB)
এ দুটি সংস্থা শিল্পকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মাধ্যামে ব্যবসায়ের চাকা সচল রাখার নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট (Bangladesh Institute of Management -BIM)
এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়ের উদ্যোক্তাউন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ব্যবসা পরিচালনা প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে থাকে।
এ ছাড়া বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নানাভাবে কারিগরি শিক্ষাদানের মাধ্যমে দক্ষজনশক্তি গড়ে তুলছে।

বেসরকারী খাত (Private Sector)
সরকারী খাতের পাশাপাশি বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এদের মধ্যে প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন, সেবা ও পরামর্শমূলক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবাদানকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হলো:

বেসরকারী ব্যাংক সমূহ (Private Commercial Bank): দেশে বর্তমানে বহু বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্পে অর্থ সহায়তা ও আমদানি রপ্তানিতে সহায়তা করছে। যেমন আবার বাংলাদেশ ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক লি:, দি সিটি ব্যাংক লি:, ইউনাইটেড কর্মাসিয়াল ব্যাংক লি:, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, শাহাজালাল ব্যাংক লি:, পূবালী ব্যাংক লি:, উত্তরা ব্যাংক লি:, ঢাকা ব্যাংক লি:, আই এফ আই সি ব্যাংক লি:, প্রাইম ব্যাংক লি:, ব্রাক ব্যাংক লি:, স্টান্ডার্ড ব্যাংক লি:, ইত্যাদি।

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে, আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, গ্রীনলেজ ব্যাংক, স্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক লি:, ব্যাংক অব ইন্দোসুয়েজ, সিটি ব্যাংক ইত্যাদি।

এসকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মূলধন গঠন, শিল্পায়ন, বাণিজ্য প্রসার, পুঁজির স্বল্পতা দূরীকরণ, ঋণ প্রত্রের প্রচলন, এল সি প্রদান ইত্যাদি ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করছে।

বীমা কোম্পানী (Insurance Company)

বাংলাদেশে সাধারণ বীমা ও জীবনবীমা নামে দুটি সরকারী বীমার পাশাপাশি বেসরকারী ও বিদেশী বীমা কোম্পানী বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ে সহায়তা দিচ্ছে।

বেসরকারাী জীবনবীমার মধ্যে ডেল্টা লাইফ ইন্সিরেন্স, আমেরিকান লাইফ ইন্সিরেন্স, ন্যাশনাল লাইফ ইন্সিরেন্স কোম্পানী, সন্ধানী লাইফ ইন্সিরেন্স কোম্পানী, মেঘনা লাইফ ইন্সিরেন্স, ফারইষ্ট ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানী ইত্যাদি। আবার সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সিরেন্স কোম্পানী, পপুলর ইন্সিরেন্স কোম্পানী, গ্রীন ডেল্টা ইন্সিরেন্স কোম্পানী ইত্যাদি।

বীমা কোম্পানীগুলো ব্যবসায় ক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে সহায়তা দান করে:

কারবার প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করে, কারবারীকে রক্ষা করে, কারবারের অর্থ সরবরাহ করে, ঝুঁকি হ্রাস করে ইত্যাদি ভাবে বীমা কোম্পানী ব্যবসা বাণিজ্যে সাহায্য করে আসছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলেটমেন্ট লিজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ (Industrial Development Leasing Company of Bangladesh)

১৯৮৫ সালে দেশী ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল লক্ষ্য হলো শিল্প প্রতিষ্ঠান লিজ নিয়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখা, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন কোম্পানীর সকল দায়দায়িত্ব বহন করে। এর কাজ হলো শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা।

গ্রামীণ ব্যাংক: গ্রামীণ ব্যাংক গ্রমের দরিদ্র লোকদের মধ্যে ঋণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়েনে সহায়তা প্রদান করে আসছে। প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে কোন জামানত প্রদান করতে হয় না। এটির কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার জোবরা গ্রামে। সাফল্যের কারণে ১৯৭৯ সনের নভেম্বর মাসে টাঙ্গাইল জেলাতেও গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৩ সনের ২ অক্টোবর সরকার গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এটিকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে রূপদান করে। বর্তমানে এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। এর প্রবক্তা অধ্যাপক ড: মো: ইউনুস। যিনি ২০০৮ সালে শন্তিতে নোবেল পুরুস্কার পান।

শিল্প ও বণিক সমিতি (Chamber of Commerce and Industries)

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা জেলার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও অঞ্চলের ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানকল্পে স্বেচ্ছায় একত্রি হয়ে শিল্প ও বণিক সমিতি গড়ে উঠেছে। এটি ব্যবসায়ীদের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। এটাকে বণিক সমিতিও বলা হয়। এখন বণিক সমিতির নিবন্ধন করতে হয়। নিম্নোক্তভাবে শিল্প ও বণিক সমিতি সাহায্য করে থাকে:

- ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, সংবাদ, ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা।
- ব্যবসায় বিষয়ক পাঠাগার পরিচালনা করা।
- সদস্যদের মধ্যে মত পার্থক্যর সালিশী ব্যবস্থা করা।
- সদস্যদের ট্রেডমার্ক ও পেটেন্ট সংক্রান্ত অধিকার রক্ষা করা।
- পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা কর্মপরিচালনা করা।
- ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের সাথে আলোচনা করা।
- ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি।

পাঠসংক্ষেপ

একজন উদ্যোক্তার বিভিন্নধরণের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এগুলো দুটি উৎস থেকে পায়। যথা ১। সরকারী সাহায্য ও ২। বেসরকারী সাহায্য। তবে আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারই মূখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এদেশের সরকারী সাহায্য সহযোগিতা জটিল ও কষ্ট সাধ্য। বেসরকারী খাতে শিল্পোদ্যোগের সাহায্য সহযোগিতার পরিমাণ খুবই কম। তবে, অধুনা বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে বেশ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছুনীতি গ্রহণ করেছে যেমন: শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্ব নীতি, রপ্তানি নীতি, বিভিন্ন প্রকার অবকাঠাম সুবিধা প্রদানের নীতি প্রভৃতি। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো; বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক), রপ্তানি উন্নয়ন বুরো, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ শিল্প ও গবেষণা পরিষদ কি?
২. বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজম্যান্ট কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সরকারী সাহায্যেকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের উৎসসমূহ বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার(বিসিক) বর্ণনা দিন।
৩. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশনের কাজ কি?
৪. বেসরকারী খাতের বর্ণনা দিন?